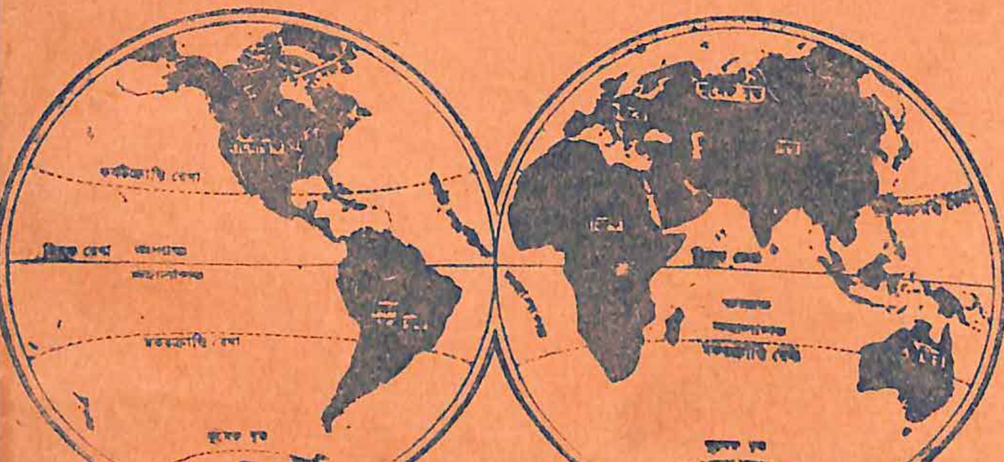
# ভারত ও ভূমণ্ডল

দ্বিতীয় পর্যায়

সপ্তম শ্রেণীর জন্য



শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় এম. এ., বি. টি
ও
সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস-সি

9694

*Recommended by the W. B. Board of Secondary Education as a text book Class VII vide No. TB/76/7/G/9 dated 31.12.76.*

# ভারত ও ভূমণ্ডল

*দ্বিতীয় পর্য্যায়*

[ সপ্তম শ্রেণীর জন্য ]



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, কালীহাতী ( ময়মনসিংহ ) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কেওড়াতলা শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

## শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., বি. টি.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউটের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

## ৺সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি.



ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯





"This book has been printed on paper allotted by Government of India at a concessional rate."



চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৭

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীযতুলাল দত্ত
এরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩, হায়াৎ খাঁ লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

# নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত সপ্তম শ্রেণীর ভূগোলের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত "ভারত ও ভূমণ্ডল" ( দ্বিতীয় পর্যায় ) প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে নূতন পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিবার সুবিধার জন্য যথাস্থানে প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। পরিসংখ্যান-বিষয়ক তথ্যসমূহ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ও সহজবোধ্য করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। ভারত ও ভূমণ্ডল-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে পুস্তকখানি সুধী শিক্ষাব্রতিগণের নিকট সমাদৃত ও স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থিবৃন্দের আশানুরূপ ফলপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, PARK STREET, CALCUTTA—700 016

REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION

FROM 1974

## SYLLABUS IN GEOGRAPHY

## CLASS VII

64 pages (50 pages reading matter and 14 pages maps, charts, diagrams, photographs etc.) Size 22″ × 32″ $\frac{1}{16}$th & pica type. 10% variation allowed as usual.

1. Situation of West Bengal in relation to the neighbouring states and countries. [2 pages]
2. A Geographical study of the following areas of West Bengal :

   The Mountainous tracts of Jalpaiguri and Darjeeling, the Western Plateau area, the Northern and Southern plains, the Sundarbans and the costal dune tracts of Midnapore. The divisions mentioned above should be explained with the help of a Map of Districts of the State. [20 pages]
3. The development plans of West Bengal with brief reference to irrigation, flood control, development of communication, industries and trade. [28 pages]

**দ্রষ্টব্য** ঃ—এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

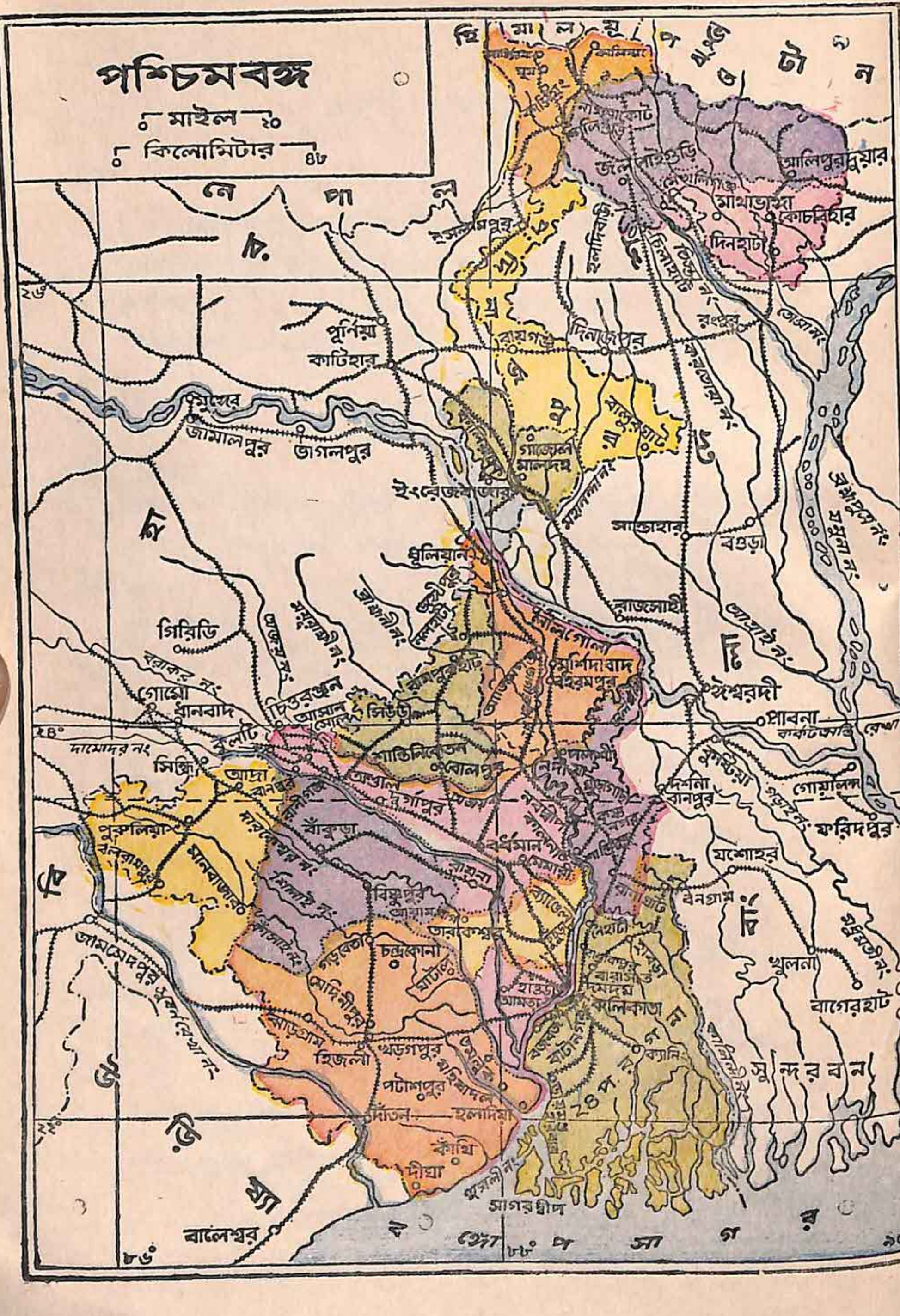
| | | |
|---|---|---|
| সে. | = | সেন্টিগ্রেড্ |
| মি. | = | মিটার |
| সে-মি. | = | সেন্টিমিটার |
| কি-মি. | = | কিলোমিটার |
| কি-ও. | = | কিলোওয়াট |
| মে-ও. | = | মেগাওয়াট |
| কে-জি. | = | কিলোগ্রাম |
| টন | = | মেট্রিক টন |
| ১ হেক্টেয়ার | = | প্রায় ২·৫ একর |



পরিসংখ্যান তথ্যাদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকাদি হইতে গৃহীত।

# সূচীপত্র

বিষয়　　　　পৃষ্ঠা


পশ্চিমবঙ্গ
মাইল
কিলোমিটার
নেপাল
বিহার
পূর্ণিয়া
কাটিহার
মুঙ্গের
জামালপুর
ভাগলপুর
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার
দিনহাটা
দিনাজপুর
রায়গঞ্জ
বালুরঘাট
গাজোল
মালদহ
ইংরেজবাজার
রংপুর
সান্তাহার
বগুড়া
রাজসাহী
ধুলিয়ান
লালগোলা
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
রামপুরহাট
গিরিডি
গোমো
ধানবাদ
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
সিউড়ী
কুলটি
শান্তিনিকেতন
বোলপুর
দামোদর নং
সিন্ধ্রি
আদ্রা
দুর্গাপুর
বাঁকুড়া
পুরুলিয়া
বলরামপুর
মানবাজার
বর্ধমান
বিষ্ণুপুর
আরামবাগ
তারকেশ্বর
চন্দ্রকোনা
গড়বেতা
ঘাটাল
মেদিনীপুর
ঝাড়গ্রাম
হিজলী
খড়গপুর
পটাশপুর
দাঁতন
হলদিয়া
কাঁথি
দীঘা
জামসেদপুর
হাওড়া
আমতা
বারাসাত
দমদম
কলিকাতা
ক্যানিং
বনগ্রাম
যশোহর
খুলনা
বাগেরহাট
সুন্দরবন
ঈশ্বরদী
পাবনা
কর্কটক্রান্তি রেখা
গোয়ালন্দ
ফরিদপুর
সাগরদ্বীপ
বালেশ্বর
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

# ভারত ও ভূমণ্ডল

## প্রথম অধ্যায়

## পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এবং প্রতিবেশী রাজ্য ও দেশসমূহের সহিত ইহার সম্পর্ক

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কি-মি., লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লক্ষের কিছু বেশী।* পশ্চিমবঙ্গ ২১° ৩০´ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ২৭° ১০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫° ৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৮৯° ৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তি রেখা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। উত্তরে দার্জিলিং হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ কি-মি.। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নহে। কর্কটক্রান্তি রেখা বরাবর ইহার বিস্তার হইবে ৩০০ কি-মি.। এই রাজ্যের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে আসাম, মেঘালয় ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার ও নেপাল।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যের পূর্বে **আসাম রাজ্য** ও স্বাধীন **বাংলাদেশ** রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। পশ্চিমে **বিহার** খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। **নেপাল** একটি স্বাধীন দেশ, ইহারও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে **সিকিম** ও **ভুটান**

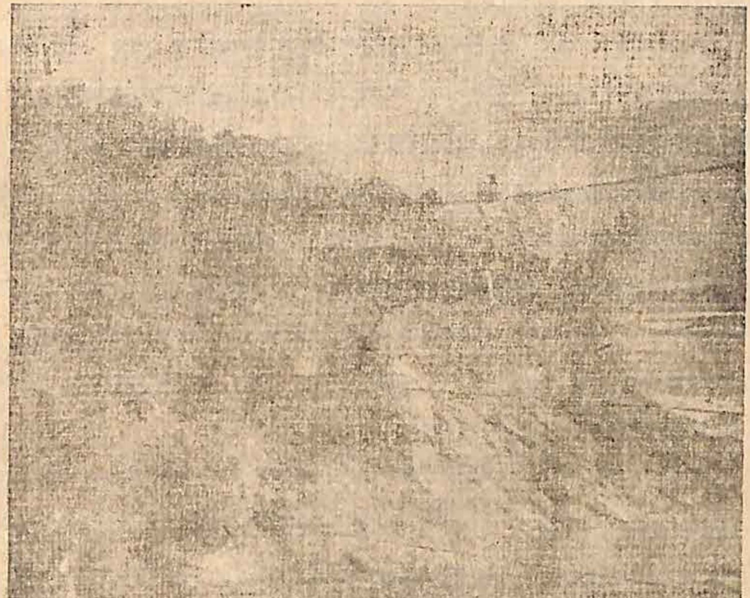
* ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোকগণনানুসারে।

দুইটি পার্বত রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রচুর নহে। সম্প্রতি সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ভুটান ও সিকিমের মধ্যবর্তী চুম্বি উপত্যকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে তিব্বতে যাওয়া যায়। চীন সীমান্তের নিকটে অবস্থিত চুম্বি উপত্যকা সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা রাজ্যেও খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে।

প্রতিবেশী রাজ্য সমূহ হইতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করিবার সুবিধা আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের। পর্বত শ্রেণীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ নেপাল, ভুটান ও সিকিম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তথাপি মানুষ স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধিবলে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। দার্জিলিং হইতে পার্বত পথে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে যাওয়া যায়। বিমানপথে কাঠমণ্ডুর সহিত ভারত-সরকারের যোগাযোগ আছে। পূর্বাঞ্চলের আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাভূমি, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারত সরকারের যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে বিমানপথে এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের রেলপথ ও সড়কপথের মাধ্যমে।

নদীপথে বিহার, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মধ্যদিয়া আসামের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ করিবার সুবিধা আছে। ইহা ভিন্ন, ফরাক্কা বাঁধের উপর রেলপথ ও সড়কপথ নির্মিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হইতে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি হইয়া প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম ও আসামের সহিত যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে। আসানসোল ও পুরুলিয়া হইয়া বিহার, এবং খড়গপুর হইয়া উড়িষ্যার সহিত রেলপথে কলিকাতার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছে। নকসালবাড়ি (শিলিগুড়ি) হইতে মেচি নদী পার হইয়া নেপালে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি হইতে মোটরপথে ডুয়ার্সের মধ্য দিয়া ভুটানের

ফুন্টোসোলিং ও পারো পর্যন্ত যাওয়া যায়। থিম্ফু হইতে পারো পর্যন্ত ভুটান সরকারের নির্মিত পথে ভারত সরকার নেপাল ও ভুটানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন। জলপাইগুড়ির বক্সাদুয়ার হইতেও ভুটানে যাইবার পথ আছে। কিন্তু পার্বত্য পথসমূহ শীতকালে বরফাবৃত থাকে এবং বর্ষাকালে ধস নামিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কেবল গ্রীষ্মকালেই এই সকল পথে চলাচল সুবিধাজনক। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে দার্জিলিং-এর চা-বাগানে রজ্জুপথের (Ropeway) সাহায্যে



রজ্জুপথ

যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কালিম্পং-এও রজ্জুপথ আছে। পার্বতপথে জীপ গাড়ীও চলাচল করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী পার্বত দেশগুলি হইতে পশম, পশু চর্ম, হাতীর দাঁত,

গণ্ডারের শিং, মোম, মধু, এণ্ডি, কম্বল, হরিণের শিং, মৃগনাভি, আলু, কমলালেবু, আপেল, এলাচি ইত্যাদি ভারত আমদানি করে এবং ভারত হইতে চাউল, বস্ত্র, তামাক, নানারকম যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি হয়। নেপাল ও ভুটান শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত নহে। তথাপি এই দুইটি দেশের সহিত ভারত সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি উহাদিগকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অনুপ্রেরণা দিতেছে। সিকিম ভারতের একটি নূতন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

বিহারের কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য, উড়িষ্যার লৌহ আকরিক পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানার জন্য আনয়ন করা হয়। আসাম হইতে এণ্ডি, মুগা, তসরের বস্ত্র ও চা পশ্চিমবঙ্গে প্রেরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী **বাংলাদেশ** কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র। এই দেশের কৃষিসম্পদের মধ্যে **ধান** ও **পাট** প্রধান। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট পাট বাংলাদেশেই জন্মে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাট শিল্পের জন্য কাঁচামাল পাট আমদানি করেন। রেলপথ, স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দ্বারা বাংলাদেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ আছে।

**কলিকাতা** পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর, দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ কলিকাতা বন্দরের **পশ্চাদ্ভূমি**। এই সকল রাজ্যের সহিত কলিকাতা সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দ্বারা সংযুক্ত। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, কয়লা ও পাটজাত দ্রব্য; বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, চর্ম, লৌহ আকরিক, অভ্র; উড়িষ্যার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য পশ্চাদ্ভূমিতে

প্রেরিত হয়। এইরূপে কলিকাতা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদম একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানপথের বিখ্যাত স্টেশন। এই বিমানবন্দর হইতে বিমানপথে দার্জিলিং এবং আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাভূমি প্রভৃতি রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ, সীমান্তবর্তী পার্বত অঞ্চলের নেপাল ও ভুটান এবং পূর্বদিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক। ইহা ভিন্ন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও রাজ্যসমূহের কিছু সংখ্যক লোক যেমন বিহারী, ওড়িয়া, নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা, ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি এই রাজ্যে বাস করিয়া শ্রমিকের কাজ করে। তাহাদের নিজ নিজ ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি আছে। তাহাদের সহযোগিতায় প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান ও সিকিমের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাবগত যোগাযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে বিচার-বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ভৌগোলিক বিবরণ

### সূচনা

শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; বিভাগগুলি ১৬টি জেলা লইয়া গঠিত। যথা—

(ক) **প্রেসিডেন্সি বিভাগ**—(১) কলিকাতা, (২) ২৪ পরগনা, (৩) নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, (৫) হাওড়া।

(খ) বর্ধমান বিভাগ—(১) বর্ধমান, (২) বীরভূম, (৩) বাঁকুড়া, (৪) পুরুলিয়া, (৫) হুগলী, (৬) মেদিনীপুর।

(গ) জলপাইগুড়ি বিভাগ—(১) জলপাইগুড়ি, (২) দার্জিলিং, (৩) কুচবিহার, (৪) মালদহ, (৫) পশ্চিম দিনাজপুর।

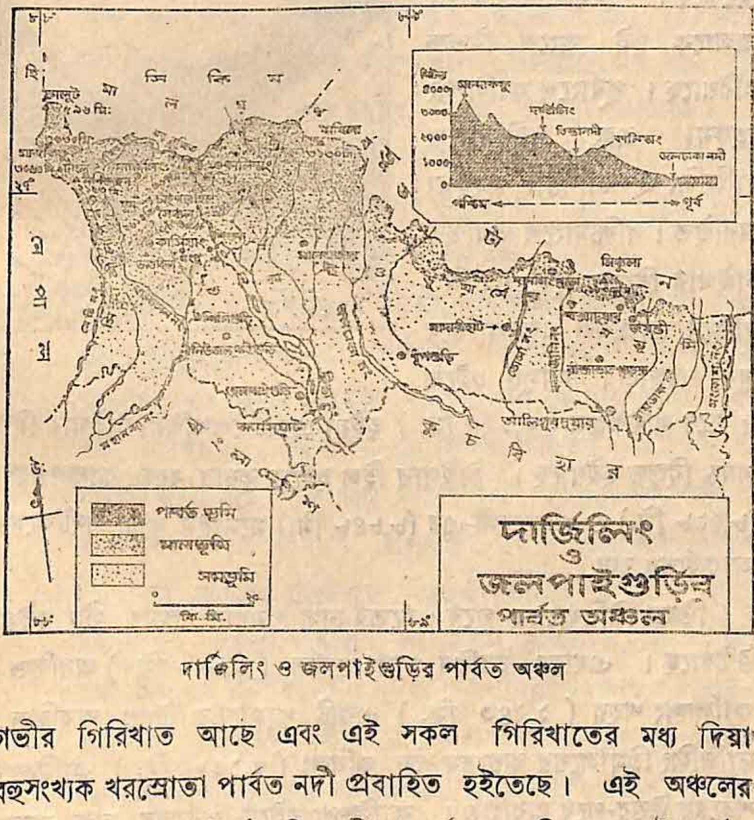
উক্ত তিনটি বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের পার্বত, মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাদ্বয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারণ ভূমি। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ গঙ্গার উত্তরদিকের সমভূমির অন্তর্গত এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, কলিকাতা প্রভৃতি গঙ্গার দক্ষিণ দিকের সমভূমির অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন, ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশের ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ যথাক্রমে সুন্দরবন ও মেদিনীপুর উপকূলের বালিয়াড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত। অঞ্চল কয়েকটির সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

## প্রথম পাঠ

# দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চল

**অবস্থান ও আয়তন :** পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলটি দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত কার্সিয়াং, কালিম্পং ও সদর মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে সামান্য অংশ লইয়া গঠিত। এই পার্বত অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ২,২৫০ বর্গ কি-মি.।

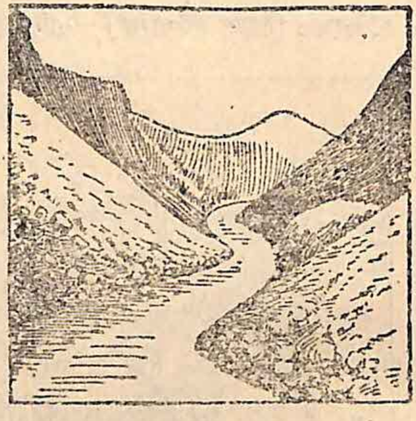
**ভূ-প্রকৃতি ঃ** পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পাহাড় পর্বতগুলি প্রধানত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কিছু কিছু শৈলশিরা পূর্ব-পশ্চিমেও বিস্তৃত হইয়াছে। এই বন্ধুর পার্বত অঞ্চলটির মধ্যে মধ্যে




দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চল

গভীর গিরিখাত আছে এবং এই সকল গিরিখাতের মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক খরস্রোতা পার্বত নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তের নিকট সিঙ্গালীলা পর্বত অবস্থিত। এই পর্বত দার্জিলিং জেলাকে নেপাল হইতে পৃথক করিয়াছে। **ফালুট** (৩,৫৯৬ মি. ), **সান্দাকফু** (৩,৬৩০ মি.) ও **টাংলু** (৩,০৬৩ মি.) ইহার উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ। দার্জিলিং-এর শৈলশিরা যেন তরাই-এর সমভূমি হইতে সেঞ্চল শৃঙ্গের (২,৬১৫ মি.) দিকে খাড়াভাবে উঠিয়া গিয়াছে।

দার্জিলিং মহকুমার পূর্ব দিকে পর্বতের ঢাল ক্রমশ নীচু হইয়া তিস্তা নদীর উপত্যকার দিকে প্রসারিত হইয়াছে। তিস্তা নদী গভীর গিরিখাতের* মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা দার্জিলিং জেলাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্বাংশে কালিম্পং মহকুমা এবং পশ্চিমাংশে দার্জিলিং ও কার্সিয়াং মহকুমা অবস্থিত। পশ্চিমাংশে অবস্থিত **টাইগার হিলের** (২,৫৬৭ মি.) দক্ষিণে **ডাওহিল** এবং পশ্চিমে **ঘুম পাহাড়**। ফালুট হইতে দক্ষিণে **মণিভঞ্জন** ( ২,১২৩ মি. ) হইয়া একটি শৈলশিরা টাইগার হিল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। টাইগার হিল হইতে তুষার ধবল **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (৮,৫৯৮ মি.) ও **এভারেস্ট**-এর (৮,৮৪৮ মি.) মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু।



গিরিখাত

তিস্তা গিরিখাতের পূর্বে পর্বতের ঢাল পুনরায় ক্রমশ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। এখানে **ডুরবিন দারা** পর্বত ( ১,৮০০ মি. ) অবস্থিত। **কালিম্পং** শহর ( ১,২৪৩ মি, ) একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দার্জিলিং হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ **ঋষিলা** ( ৩,১৩০ মি. ) কালিম্পং শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কালিম্পং হইতে পর্বতের ঢাল ক্রমশ নীচু হইয়া পূর্বদিকে জলঢাকা নদীর উপত্যকার দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তিস্তা নদীর পূর্ব দিকে তরাই-এর সমতল ভূমি এবং জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত অঞ্চল। এই জেলার কুমারগ্রাম ও কালচিনিতে অনেক

* নদী পার্বতপথে চলিতে চলিতে উহার গতিপথে শিলাস্তরকে কাটিয়া একটি সঙ্কীর্ণ ও গভীর পরিখার সৃষ্টি করে। উহাকে গিরিখাত বলে ; এই খাতের উভয়পার্শ্ব খুব উঁচু থাকে।

ছোট ছোট পাহাড় আছে। জলপাইগুড়ি জেলার সর্বোচ্চ পর্বত **সিঞ্চুলা** ( ১,৮০০ মি. ) ভুটান সীমান্তে অবস্থিত। **বক্সাদুয়ার** ও **জয়ন্তীর** পাহাড়গুলির দৃশ্য খুব সুন্দর। পাহাড়িয়া অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র ঘন বনভূমি দেখা যায়। দার্জিলিং-এ পর্বতশ্রেণী প্রায় খাড়াভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে সুখিয়াপোখরি, ঘুম, কার্সিয়াং ও তিনধারিয়া হইয়া তরাই-এর দিকে নামিয়া গিয়াছে। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সমতল ভূমির নাম **তরাই**। জলপাইগুড়িতে ঐরূপ ভূমিকে **ডুয়ার্স** (ভুটানের দুয়ার) বলা হয়। ডুয়ার্সের বনভূমি পশ্চিমের তরাই-এর বনভূমির সহিত যুক্ত।

**নদ-নদী ঃ মেচি, বালাসন, মহানন্দা, জলঢাকা, বড় রঙ্গিত, ছোট রঙ্গিত** প্রভৃতি নদী দার্জিলিং হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কার্সিয়াং-এর নিকট মহানন্দা নদী পাগলা ঝোরায় একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলের নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে, কিন্তু এই সকল নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার সুযোগ আছে। জলঢাকা নদীর খরস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া উত্তরবঙ্গে শিল্প-কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। **তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, সংকোশ** প্রভৃতি নদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে পার্বত অঞ্চলের নদীগুলি পুষ্ট বলিয়া এই সকল নদী সারা বৎসর জলপূর্ণ থাকে। **তিস্তা** এই পার্বত অঞ্চলের প্রধান নদী। সিকিম হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে হিমালয় অঞ্চলে প্রবল বারি বর্ষণ হইলে জল প্রচণ্ড বেগে নদী-খাত দিয়া বহিতে থাকে। ফলে, বর্ষার বাড়তি জল অগভীর নদী-খাত ধারণ করিতে অক্ষম হয় বলিয়া বর্ষা-

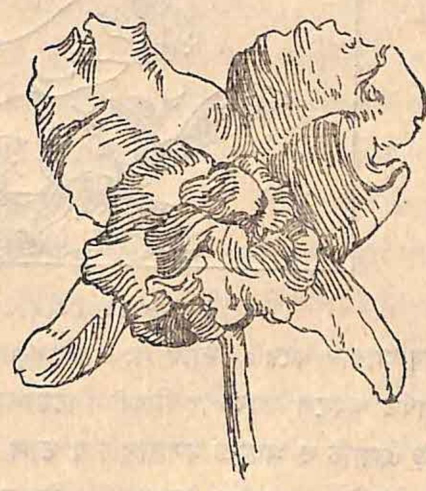
কালে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। তিস্তার ধ্বংসলীলার জন্য ইহাকে 'দুঃখের নদী' বলা হয়।

**জলবায়ু**: পশ্চিবঙ্গের উত্তরাংশে পার্বত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী। শীতকালে দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ২°সে. এবং উত্তরাংশে ০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা নামিয়া পড়ে। দার্জিলিং-এ ২,০০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা গড়ে ১৪°—১৮° সে., তবে উচ্চতার আধিক্যে তাপমাত্রা কমিয়া যায়। উচ্চতার জন্য দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি পার্বত শহরের জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়, বৎসরে গড়ে ২৫০—৩৫০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতগাত্র হইতে ধস নামিয়া পথঘাট বন্ধ হইয়া যায়। শীতকালে এই পার্বত অঞ্চলের উপর দিয়া শীতল ও শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতকালে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় না।

**স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**: দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্বতগাত্রের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে বলিয়া উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন উদ্ভিদ্ জন্মে। পর্বতের পাদদেশে তরাই ও ডুয়ার্সের বনভূমিতে ৩০০—১০০০ মি. পর্যন্ত উচ্চতায় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। শাল, সেগুন, গর্জন, জারুল, শিশু, শিমূল, চাঁপ, গামার, হলুদ, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। বক্সাদুয়ারের পাহাড়িয়া অঞ্চলের অরণ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাল গাছ জন্মে। শাল ও সেগুন খুব মূল্যবান কাঠ। আসবাবপত্র, রেলের শ্লিপার, সেতু ও গৃহ নির্মাণের কাজে এই সকল কাঠ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ও নরম কাঠ দিয়াশলাই ও কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসাবেও বনভূমির বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ১,০০০—২,০০০ মিটার

উচ্চতায় ওক, ম্যাপল, টুন, বার্চ, জরেল, বাদাম, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষ জন্মে। ২,০০০—২,৫০০ মিটার পর্যন্ত পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। ২,৫০০ মিটারের অধিক উচ্চে রূপালি ফার, রডোডেনড্রন প্রভৃতি আল্পীয় বনভূমির বৃক্ষ দেখা যায়। আরও উর্ধ্বে পর্বতগাত্র তুষারাবৃত থাকে। দুর্গম পার্বত অঞ্চলের গভীর বনভূমিতে পরিবহনের বিশেষ সুবিধা না থাকিবার ফলে, বনজসম্পদের সদ্ব্যবহার আশানুরূপ নহে। তথাপি অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই পার্বত অঞ্চলের বনজ সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

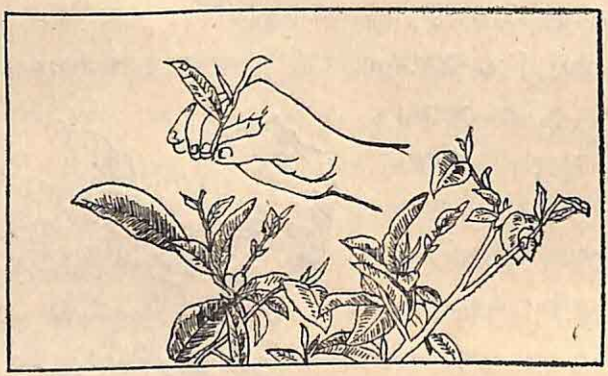
পার্বত অঞ্চলে অর্কিড ফুলের সমারোহ দেখা যায়। সুন্দর অর্কিড ফুল রপ্তানি করিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বনবিভাগ অর্কিড সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পাইন জাতীয় বৃক্ষ হইতে তার্পিন তৈল, রজন এবং কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাইয়ের কাঠি, কাগজের মণ্ড ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।



অর্কিড ফুল

**কৃষিজাত দ্রব্য:** পার্বত অঞ্চলের মৃত্তিকা কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী নহে। পর্বতের উপরকার মাটি অপেক্ষা পাদদেশের পলিময় মাটি উর্বর। পর্বতগাত্রের মৃত্তিকা কঙ্করময় ও পড্সল (Podzol) জাতীয়। এই মাটির রঙ ধূসর ও বাদামী। ইহার

অম্লত্ব বেশী বলিয়া ইহা অনুর্বর। পর্বতগাত্রে কিছু ঝুমিং বা ঝুম-চাষ হয়। এই অঞ্চলে ধান, গম, যব, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি খাদ্য শস্যের চাষ হয়। ইহা ভিন্ন, মটর, কপি, স্কোয়াশ প্রভৃতি সব্জীর চাষ হয়। পার্বত অঞ্চলের **বাগিচা-কৃষিই** (Plantation farming) বিশেষ উন্নত। এখানকার বাগিচাগুলিতে **চা, সিঙ্কোনা, বড় এলাচি, আনারস, কমলালেবু** প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। লেপচা, ভুটিয়া ও নেপালীরা



চা-পাতা তোলার চিত্র

চাষ আবাদ করে। দার্জিলিং-এর **কমলালেবু** বিখ্যাত। দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলে তাকদার নিকট **সিঙ্কোনার** চাষ হয়। কালিম্পং-এ বড় এলাচি ও অন্যান্য মসলার চাষ ভাল হয়।

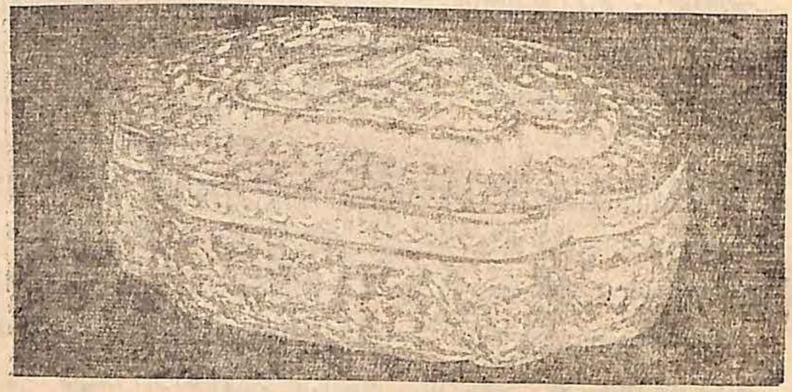
বাগিচা ফসলের মধ্যে চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলপাইগুড়ির পাহাড় অঞ্চলের বন পরিষ্কার করিয়া এবং জল নিষ্কাশন করিয়া দেড় শতাধিক চা-বাগান তৈয়ারি করা হইয়াছে। দার্জিলিং-এর চা পৃথিবী বিখ্যাত। পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া ইহার চাষ করা হয়। চা-এর বার্ষিক উৎপাদন ১১·০৫ কোটি মেট্রিক টন।

**খনিজ সম্পদ ঃ** দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত কালিম্পং মহকুমার ডালিংকোটে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। জলপাই-

গুড়ির পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত জয়ন্তীতে গুঁড়া কয়লা পাওয়া যায়। বক্সা ও জয়ন্তীতে **তামা, ডলোমাইট** ও **চুনাপাথর** সঞ্চিত আছে। কালিম্পং-এ সীসা ও দস্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পার্বত অঞ্চলের অন্যান্য খনিজের মধ্যে লোহা পাথর, গ্রাফাইট, সোপস্টোন প্রভৃতি কিছু পরিমাণ পাওয়া যায়।

**শিল্প : চা-শিল্পই** এই পার্বত অঞ্চলের প্রধান শিল্প। এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নতি প্রধানত এই শিল্পের উপরই নির্ভরশীল। জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলে ১৫৫টি চা-বাগান আছে। দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলেও শতাধিক চা-বাগান রহিয়াছে। দার্জিলিং-এর চা স্বাদে ও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বাজারে বেশী দামে বিক্রয় হয়। হ্যাপিভ্যালি টি গার্ডেন (The Happy Valley Tea Garden) এবং উহার নিকটবর্তী চা-শিল্প কেন্দ্র বিখ্যাত। চা অর্থপ্রসূ ফসল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা রপ্তানি করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। চা-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এই পার্বত অঞ্চলে প্লাইউড ও চা-এর বাক্স তৈয়ারি করিবার অনেক কাঠের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চা-গাছ হইতে উহার শাখার একটি কুঁড়ি ও দুইটি কচি পাতা তুলিয়া লওয়া হয়। চা-এর পাতা ও কুঁড়িগুলি কারখানায় নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শুকাইয়া লইবার পর যে চা প্রস্তুত হয় তাহাকে কালো চা বলে। দার্জিলিং ও কার্সিয়াং-এ চা-এর কারখানা আছে। চা-শিল্প ব্যতীত এই পার্বত অঞ্চলে নানারকম **কুটীরশিল্প** উল্লেখযোগ্য। **মংপুতে** সিঙ্কোনা গাছের বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। এই পার্বত অঞ্চলের কুটীর শিল্পের মধ্যে চামড়ার জুতা ও ব্যাগ নির্মাণ, ফলসংরক্ষণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, বর্ষাতি ও মাথার টুপী নির্মাণ, কাঠ, বেত, বাঁশ, শোলা প্রভৃতির সাহায্যে নানা-

রকম সৌখিন দ্রব্য নির্মাণ, পাথরের অলঙ্কার নির্মাণ, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লেপচা,



হস্তশিল্পের কারুকার্য

ভুটিয়া, নেপালী প্রভৃতি পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা নানারকম কুটীর শিল্পের কাজে দক্ষ।

**যাতায়াতের ব্যবস্থা:** ৩৪ নং জাতীয় সড়ক পথে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি এবং তথা হইতে ৩১(ক) নং জাতীয় সড়ক পথে শিভক, তিস্তাবাজার, রংপো হইয়া সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে যাওয়া যায়। দার্জিলিং হইতে তিস্তা পার হইয়া সিকিমে যাইবার পথ আছে। শিলিগুড়ি হইতে 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথে' তিনধারিয়া, কার্সিয়াং, সোনাদা ও ঘুম হইয়া দার্জিলিং-এ যাওয়া যায়। রেলপথের পাশে সড়ক পথও দার্জিলিং শহর পর্যন্ত গিয়াছে। জীপ ও মোটরযোগে সড়ক পথেও যাতায়াত করা যায়। ঘুম হইতে বিজনবাড়ী, মংপু, টাইগার হিল, তিস্তাবাজার প্রভৃতি স্থানে বাস চলাচল করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের কিছু অংশ বক্সারোড

হইয়া জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলে জয়ন্তী পর্যন্ত গিয়াছে। জয়ন্তী হইতে বক্সা দুয়ার হইয়া সড়কপথে ভুটানে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে বিমানপথে বাগডোগরা (শিলিগুড়ি) পর্যন্ত পৌঁছিয়া পরে মোটরযোগে দার্জিলিং শহরে যাওয়া যায়। এই পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত শহরগুলির পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা আছে। শীতকালে তুষারপাতের ফলে এবং বর্ষাকালে ধস নামিয়া রেলপথ ও সড়কপথ বন্ধ হইলে রজ্জুপথে যাতায়াত চলে। চা-বাগানগুলিতে রজ্জুপথে মালপত্র পরিবাহিত হয়।

**জীবজন্তু ঃ** পার্বত অঞ্চলে চিতাবাঘ, বুনোহাতী, একশৃঙ্গ গণ্ডার, সম্বর, চিতল প্রভৃতি নানাজাতির হরিণ বাস করে। জলপাইগুড়ির



চিতা বিড়াল

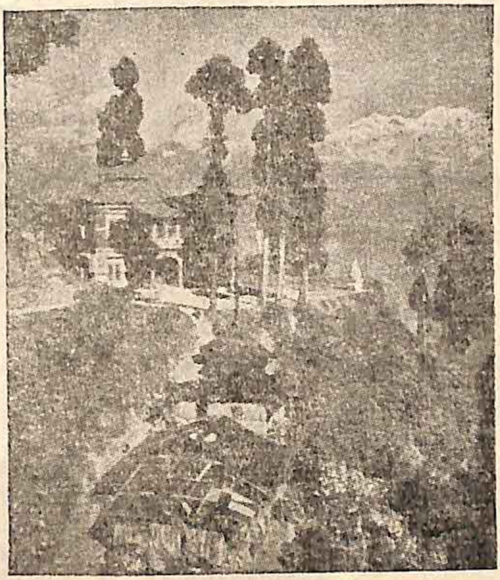
পার্বত অঞ্চলের বনভূমিতে চিতা বিড়াল নামে একটি দুর্লভ প্রাণী

বাস করে। তোর্সা নদীর তীরে **জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে** বন্যজন্তু সংরক্ষিত হয়। ঘুম স্টেশনের নিকট **সেণ্ট্রাল অভয়ারণ্যে** সম্বর, চিতল, বার্কিং-ডিয়ার, হগডিয়ার, হর্ণবিল প্রভৃতি জন্তু সংরক্ষিত হয়। অসংখ্য রঙ বেরঙের পাখীও এই পার্বত অঞ্চলের অরণ্যে দেখা যায়।

**অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা ঃ** সাধারণত পার্বত অঞ্চলে লোকবসতি সমতলভূমির লোকবসতি অপেক্ষা কম। কারণ, পার্বত অঞ্চলে কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব, বিদ্যুৎশক্তির অভাব এবং যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত না থাকায় জীবিকা নির্বাহ কষ্টকর। সুতরাং সেখানে লোকবসতি বিরল। আবার দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলের লোকবসতি জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলের লোকবসতি অপেক্ষা কম। এই পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে **নেপালীদের** সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে আছে সাঁওতাল, ভুটিয়া, লেপচা, ওরাওঁ, মেচ, মহলি প্রভৃতি। শহরগুলিতে অনেক বাঙ্গালীও বাস করে। চাষ-আবাদ, চা-বাগানে ও চা-শিল্পে শ্রমিকের কাজ, পশুপালন, পশুচারণ ও নানারকম হস্তশিল্পের কাজ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

**শহর ঃ** **দার্জিলিং** শহর (২,২৩৩ মি.) হিমালয় ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস ও স্বাস্থ্যকর স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য দার্জিলিংকে 'পাহাড়ের রাণী (Queen of Hills) বলা হয়। ইহা একটি শৈলনিবাস ও বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। দার্জিলিং-এর 'অবজারভেটারি হিল', 'লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেনস্', 'ভিক্টোরিয়া ফলস্', বৌদ্ধমঠ, 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট' প্রভৃতি দর্শনীয় বস্তু। **শিলিগুড়ি** রেলওয়ে জংশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ঘুম** (২,৪০০ মি.) একটি পার্বত রেলস্টেশন। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। **কার্শিয়াং** (১,৪৮০ মি.) স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে বেতার স্টেশন ও বনবিভাগের অফিস আছে। **কালিম্পং** (১,২৪৩ মি.)

স্বাস্থ্যকর স্থান ; এখানকার বৌদ্ধমঠ, হিন্দুমন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।



দার্জিলিং-এর বৌদ্ধমঠ

এখানে তিব্বতীয় পশুলোমের বাজার আছে। ইহা একটি পর্যটন কেন্দ্র। জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত বক্সাতুয়ার উল্লেখযোগ্য স্থান।

## দ্বিতীয় পাঠ

## পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

**প্রাকৃতিক বিবরণ**—পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ মালভূমি অঞ্চল। ইহা ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারণ মাত্র। এই বিস্তীর্ণ


পশ্চিমের
মালভূমি
(পশ্চিমবঙ্গ)
০ ৬০
কি.মি.
১৫০মি হইতে৪০০মি
নেপাল
ভূ টা ন
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
তিস্তা নং
মালদহ
গঙ্গা নং বা পদ্মা নং
রামপুরহাট
সিউড়ী
আসানসোল
অজয় নং
বর্দ্ধমান
নদীয়া
বাঁকুড়া
পুরুলিয়া
দামোদর নং
রাণাঘাট
হু গ লী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
সুবর্ণরেখা নং
২৪ পরগনা
হুগলী নং
বঙ্গোপসাগর
মেঘনা নং
২৬°
২৪°
২২°
৮৮°
৯০°

মালভূমি অঞ্চলের গড় উচ্চতা ২০০ মিটার। এই অঞ্চলের মাঝে মাঝে কঠিন শিলা (গ্রানাইট, নীস প্রভৃতি) দ্বারা গঠিত পাহাড় আছে। পাহাড়গুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলার **বাঘমুণ্ডি** বা **অযোধ্যা** পাহাড় ও **পাঞ্চেৎ** পাহাড় (৬৪৩ মি.) এবং বাঁকুড়া জেলার **বিহারীনাথ** (৪৩৭ মি.), **শুশুনিয়া** পাহাড় (৪৪০ মি.) উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের নাম গোর্গাবুরু (৬৬৭ মি.)। বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমভাগের ভূমি কিছুটা উঁচু ও অসমতল। পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম অংশের ভূমি ৪০০ মিটারের অধিক উচ্চ। ইহা বাঘমুণ্ডির মালভূমি নামে পরিচিত। পশ্চিমের এই মালভূমি অঞ্চলে দুই রকম মৃত্তিকা দেখা যায়, যথা—(১) ল্যাটেরাইট বা লৌহ মিশ্রিত লাল অনুর্বর মৃত্তিকা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে এইরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। (২) কঙ্করময় লাল মৃত্তিকা—বীরভূম ও বর্ধমানে এইরূপ মৃত্তিকা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চলটি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ফলে নদীগুলি ঢাল অনুসারে পশ্চিম হইতে পূর্ববাহিনী হইয়াছে। **ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী** বা **কাঁসাই, শিলাবতী** বা **শিলাই** প্রভৃতি নদ-নদী ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের অন্তর্গত বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদীর মিলিত প্রবাহের নাম **রূপনারায়ণ**। রূপনারায়ণ এবং কাঁসাই কলিকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। কাঁসাই ও উহার উপনদী **কালিয়াঘাই**-এর যুক্ত প্রবাহের নাম **হলদী** নদী। কংসাবতীর উপনদী **কুমারী**

পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতীতে মিশিয়াছে। **সুবর্ণরেখা** ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মেদিনীপুর জেলার কতকাংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উড়িষ্যা রাজ্যের সীমান্তে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

**জলবায়ু**—পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। এই রাজ্যের পশ্চিমভাগ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রবল। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে তাপের পার্থক্য বেশী এবং বৃষ্টিপাত কম। গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা ৪০°—৪৫° সে.; শীতের গড় তাপমাত্রা ২০°—২২° সে.। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০—১৩০ সে-মি.।

**স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগে বনভূমি আছে। এই সকল বনে **শাল, মহুয়া, পলাশ, বকুল, বাব্‌লা, খয়ের, তাল, শিমুল, কুসুম, কুল** প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এই সকল বন্যবৃক্ষের শিকড় মাটি আটকাইয়া রাখে বলিয়া ভূমির ক্ষয় নিবারিত হয়। পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছে **লাক্ষা-কীটের** চাষ হয়। লাক্ষা কীটের দেহ হইতে এক প্রকার আঠার মত রস বাহির হয়। উহা দ্বারা গালা তৈয়ারি হয়। মহুয়ার ফল ও বীচি হইতে মদ্য ও তৈল প্রস্তুত হয়। শাল কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়।

**জলসেচ**—বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম বলিয়া তথায় **জলসেচের** সাহায্যে চাষ-আবাদ চলে। **দামোদর ও ময়ূরাক্ষী** নদীতে সেচবাঁধ দিয়া বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার চাষের জমিতে জল এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া কলকারখানা ও অন্যান্য কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। বাঁকুড়ায় **কংশাবতীতে** বাঁধ দিয়া চাষের জমিতে জল-

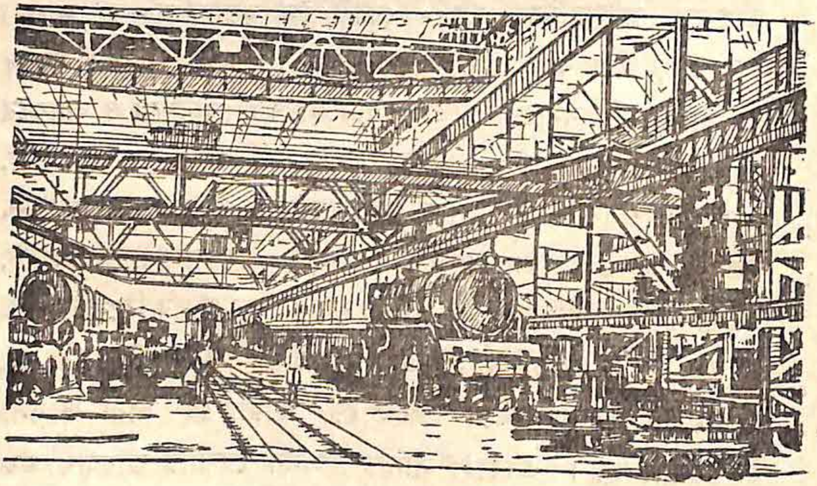
সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। অম্বিকানগরের নিকটে কংসাবতী জলাধার এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ের নিকটে পাঞ্চেৎ জলাধার নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার চাষের জমিতে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্য—মালভূমি অঞ্চলে ধান প্রধান কৃষিজাত ফসল। ইহা ব্যতীত, এই অঞ্চলে **গম, সরিষা, তিল, তিসি, তামাক, ইক্ষু, আলু, তুলা, কলাই** প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় রেশমকীটের খাদ্য হিসাবে তুঁত গাছের চাষ হয়। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় প্রচুর গমের চাষ হইতেছে।

**খনিজ সম্পদ**—পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে রাণীগঞ্জে ও আসানসোলে দুই শতাধিক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার খনি আছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি-ভাণ্ডারে আনুমানিক ১,৩০০ কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে। ভারতের ১/৩ অংশ কয়লা পশ্চিমবঙ্গে উত্তোলিত হয়। কয়লা সম্পদ এই রাজ্যের শিল্পসমূহের উন্নতির প্রধান কারণ। বার্নপুরে ও বরাকরে **লৌহ প্রস্তর**, পুরুলিয়া ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে **ফায়ার ক্লে, চুনাপাথর ও কেওলিন**, বাঁকুড়া জেলায় সামান্য পরিমাণে **তাম্র, অভ্র, উলফ্রাম ও কোয়ার্টজ**, পুরুলিয়া জেলায় **চুনাপাথর, গ্রাফাইট, ডলোমাইট ও সিলিমেনাইট** পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেণ্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কেওলিন হইতে চীনামাটির জিনিস তৈয়ারি হয়, ডলোমাইট ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়, 'ফায়ার ক্লে' দ্বারা তাপসহ ইট তৈয়ারি হয়। গ্রাফাইট সীসার জিনিস তৈয়ারি করিবার জন্য এবং সিলিমেনাইট কাঁচ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। মেদিনীপুরের মালভূমি অঞ্চলে সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ও সোপস্টোন পাওয়া যায়।

**শিল্প**—আসানসোল-রাণীগঞ্জ-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল কয়লাখনিকে

কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়লা ও শিল্পের উপযোগী অন্যান্য কাঁচামালের সহজ-লভ্যতা, জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ পাইবার সুবিধা, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, জলপথে ও রেলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা, প্রচুর জল, শ্রমিক, বাজার ও মূলধন ইত্যাদির সুবিধা থাকিবার ফলে এই অঞ্চলে বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের **লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প**, চিত্তরঞ্জনের **রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প** ও দুর্গাপুরের **ইস্পাত-শিল্প** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় কুলটী, বার্নপুর ও হীরাপুর—এই তিনটি স্থানের ইস্পাত প্রকল্পের মিলিত নাম 'ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী' (I. I. S. Co.)। রাণীগঞ্জের কয়লা, উড়িষ্যার লৌহ, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আনিয়া এই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জনে **রেল-ইঞ্জিন**

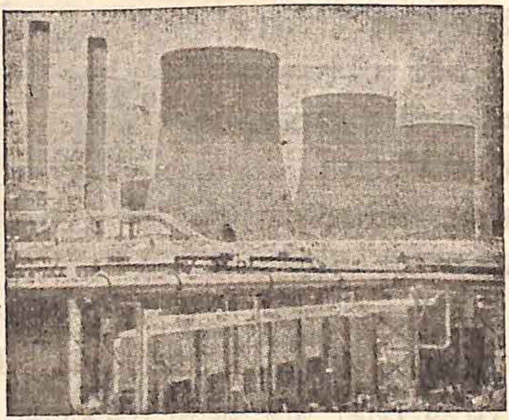


চিত্তরঞ্জন কারখানা

**নির্মাণের** বিরাট কারখানা আছে। এই কারখানায় বছরে ৩০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারি করিবার মত ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এখানে

বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন তৈয়ারি হইতেছে। দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় একটি বিরাট ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে নানারকম যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয়।

দুর্গাপুরে **তাপ-বিদ্যুৎ** উৎপাদন কেন্দ্র ও কোক তৈয়ারির চুল্লী আছে। কোক কয়লা ইস্পাত কারখানায় লৌহ গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন, কোক কয়লার ধোঁয়া হইতে **গ্যাস**, আলকাতরা, স্যাকারিন প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে **লেন্স** তৈয়ারির ও **সার** উৎপাদনের কারখানা আছে। দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুরে এত অধিক সংখ্যক শিল্প সমাবেশ হওয়ায় ইহাকে পশ্চিম জার্মানীর **রূঢ় (Ruhr)** অঞ্চলের সহিত তুলনা করা হয়। এতদ্ভিন্ন, আসানসোলের নিকট **সাইকেল** ও **এ্যালুমিনিয়ম** কারখানা, রূপনারায়ণপুরে **বৈদ্যুতিক তার**

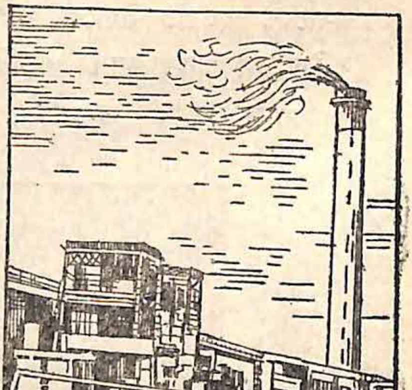


দুর্গাপুরের কোক চুল্লী

তৈয়ারির কারখানা, রাণীগঞ্জে **কাগজের কল**, বার্নপুরে **টালি, পাইপ** প্রভৃতি মাটির জিনিস তৈয়ারির কারখানা, বীরভূম জেলার আহমদপুরে

**চিনির কল** স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে আছে **রেলগাড়ি ও ইঞ্জিন মেরামতের** কারখানা। এই জেলায় **হাঁস-মুরগী পালনকেন্দ্র** আছে।

**সান্তালদিতে** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় পুরুলিয়া জেলার অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি সাধন হইবে। ৪৮০ মে-ও. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনক্ষম ৪ ইউনিটের এই কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২টি ইউনিট তৈয়ারি হইয়াছে। অবশিষ্ট ২টি ইউনিট নির্মাণের কাজ চলিতেছে। ভুপালের 'ভারত হেভি ইলেক্‌ট্রিক্যালস্' এই কেন্দ্রের ইউনিট তৈয়ারির ভার গ্রহণ করিয়াছে। ট্রানস্‌মিসন লাইনের মাধ্যমে সান্তালদি হইতে বিদ্যুৎ কলিকাতায় সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই জেলায় নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে একটি **সিমেণ্টের** কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে।



সান্তালদি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের **কুটীর শিল্পের** মধ্যে বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও বীরভূমের **রেশম-শিল্প**, পুরুলিয়ার গালা শিল্প ও বার্ণিশ তৈয়ারির শিল্প, শ্রীনিকেতনের (বীরভূম) বেতের মোড়া, ঝুড়ি, চর্মশিল্প ও নানারকম **হস্ত-শিল্পের** কার্য, মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প উল্লেখযোগ্য।

**যাতায়াত ব্যবস্থা**—খনি ও শিল্পাঞ্চলের উপর দিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, জেলা সড়ক, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ চলিয়া গিয়াছে।

রেলপথ ও সড়কপথের দ্বারা পশ্চিম মালভূমিতে অবস্থিত শহরগুলি কলিকাতার সহিত সংযুক্ত।

**জীবজন্তু**—পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের বনভূমিতে চিতা ও নেকড়ে বাঘ, খরগোস, শৃগাল, সরীসৃপ, বনবিড়াল, হনুমান ও বানর দেখা যায়।

**অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা**—পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষি ও শিল্পকার্যে নিযুক্ত, অবশিষ্ট লোকেরা চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে **সাঁওতাল, লোধা, ওরাওঁ, মুণ্ডা,** হো, বীরহোড় প্রভৃতি কিছু সংখ্যক আদিবাসী বাস করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে আসানসোল, দুর্গাপুর প্রভৃতি খনি ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের কাজ করে।

**নগর**—সিউড়ি বীরভূম জেলার সদর ও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। **বক্রেশ্বরে** উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বাঁকুড়া জেলার **জয়রামবাটী** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মস্থান। **পুরুলিয়া** জেলায় **ঝালদা** ও **বলরামপুরে** লাক্ষা হইতে গালা তৈয়ারির কারখানা আছে। **রঘুনাথপুর** কুটীর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **মেদিনীপুর** জেলার **ঝাড়গ্রাম** স্বাস্থ্যকর স্থান ; এখানে একটি কৃষি কলেজ আছে।

## তৃতীয় পাঠ

# উত্তর ও দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল

**প্রাকৃতিক বিবরণ**—উত্তরের পার্বত অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভূমিই নদীবাহিত পলির দ্বারা গঠিত **সমভূমি**। ইহাকে নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমি বলা হয় ( Lower


পশ্চিমবঙ্গ
০ কি.মি. ৬০
প্রাকৃতিক :–
পার্বত অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
মালভূমি
সমভূমি
নিম্নভূমি
বালিয়াড়ি
সিকিম
ভুটান
হিমালয় পার্বত অঞ্চল
নেপাল
২৬°
২৪°
২২°
৮৮°
উঃ
গঙ্গা নং
পদ্মা নং
তিস্তা নং
জলঢাকা নং
তোর্সা নং
আত্রাই নং
বরেন্দ্রভূমি
করতোয়া নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কাঁসাই নং
সুবর্ণরেখা নং
রূপনারায়ণ নং
হলদী নং
কর্কট ক্রান্তি
সুন্দরবন
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

Ganges Plain )। গঙ্গানদী ( পদ্মা ) এই বিরাট সমভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। গঙ্গানদীর উত্তরে কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ **প্রাচীন পলি** দ্বারা গঠিত সমভূমি। স্থানে স্থানে পলিমাটি ৩০৫ মিটারের অধিক গভীর। ইহা **বরেন্দ্রভূমি** ( Barind Tract ) নামে পরিচিত। ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে ঢালু। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুরের পূর্বাংশ দক্ষিণের সমতল ভূমির অন্তর্গত। গঙ্গা-ভাগীরথী নদী বাহিত **নবীন পলিমাটি** দ্বারা এই সমভূমি গঠিত। ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমদিকে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্তে যে সমতল ভূমি অবস্থিত উহাকে বলা হয় **রাঢ়ভূমি** ( Rarh plain )। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালুভাবে নামিয়া গিয়াছে। ইহার অনেক স্থানে বালিস্তর দেখা যায়। ভাগীরথী-হুগলীর পূর্বদিকের নিম্ন সমতল ভূমিকে বলা হয় **বাগড়ী** ( Bagri )। মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া, ২৪-পরগনা ও কলিকাতা ইহার অন্তর্গত।

পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের প্রধান নদী গঙ্গা মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোত **পদ্মা** নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নাম **হুগলী**।

গঙ্গা দীর্ঘকাল ধরিয়া পলি সঞ্চয় করিয়া নূতন ভূ-ভাগ বা ব-দ্বীপ গঠন করিয়াছে। পলি সঞ্চয়ের ফলে ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশের আয়তন **ক্রমশ** বৃদ্ধি পাইতেছে। নদীর নিম্ন প্রবাহে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ, পলি, বালি প্রভৃতি জমিয়া মোহানায় মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে। ইহাকে **ব-দ্বীপ** বলে। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া নদীর স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া বহিয়া যায়।

গঙ্গার দক্ষিণে বিশাল ব-দ্বীপই প্রকৃত ব-দ্বীপ (Delta proper)। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের পূর্বাংশ বাংলা দেশের এবং পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। পশ্চিমাংশের ব-দ্বীপকে তিন-ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ** (Moribund Delta)—মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা ইহার অন্তর্গত। জলঙ্গী, ইছামতী, চূর্ণী, ভৈরব প্রভৃতি নদী গঙ্গা বা পদ্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহাদের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইতে পারে না। পলিতে নদীখাত ভরাট হওয়ায় উহারা মজিয়া গিয়াছে। (২) পলিমাটির দ্বারা আবৃত **পরিণত ব-দ্বীপ** (Mature Delta); বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের পূর্বাংশ এবং হাওড়া ও হুগলী জেলার সর্বাংশ এই ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। (৩) **প্রাণবন্ত বা সক্রিয় ব-দ্বীপ** (Active Delta)—২৪ পরগনা জেলার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

**দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই** রাঢ়ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলীর সহিত এবং **ময়ূরাক্ষী ও অজয়** ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বক্রেশ্বর, দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদী ময়ূরাক্ষীতে পড়িয়াছে। উত্তরাংশের বরেন্দ্রভূমিতে মালদহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত **মহানন্দা গঙ্গার** ( পদ্মার ) উপনদী। কালিন্দী ও টাঙ্গন নদী মহানন্দায় পড়িয়াছে। **তোর্সা, জলঢাকা, তিস্তা** প্রভৃতি নদী কুচবিহারের এবং **আত্রাই ও পুনর্ভবা** ( সামান্য অংশ ) পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়িয়াছে। পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

**ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল, পিয়ালী, মাতলা, বিদ্যাধরী, গোসাবা** প্রভৃতি নদী ২৪ পরগনা জেলার উপর দিয়া ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়াছে। পিয়ালী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদী মৃত প্রায় ; বর্তমানে এই নদীগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

গঙ্গানদীর মূল স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া ভাগীরথীর স্রোতের বেগ কমিয়া যাইতেছে। হুগলী নদীর মোহানা হইতে অভ্যন্তরে নবদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রের জোয়ারের জল প্রবেশ করে। ইহার ফলে ভাগীরথী ও হুগলীর নদীগর্ভে পলি সঞ্চিত হইয়া চর পড়িতেছে। তাহাতে কলিকাতা বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল দুঃসাধ্য হইয়াছে। ড্রেজারের ( মাটি কাটিবার যন্ত্র) সাহায্যে মাটি কাটিয়া নদীখাত গভীর করিয়া দিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট গঙ্গাবক্ষে **ফরাক্কা ব্যারেজ** ( সেচবাঁধ ) তৈয়ারি হইয়াছে। এই প্রকল্প কার্যকরী হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভাগীরথী-হুগলীতে জলবৃদ্ধি পাইবে; কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে এবং মৃতপ্রায় নদীগুলি জলপূর্ণ হইয়া সজীব হইবে।

**জলবায়ু**—সমতলভূমির জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ইহা মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল। ইহার দক্ষিণাংশ সমুদ্রের নিকটবর্তী, উত্তরাংশ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই তীব্র। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্ম মৃদু-ভাবাপন্ন। সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের গড় উষ্ণতা ৩৫° সে.। শীতের গড় উষ্ণতা ১৮° সে.। গ্রীষ্মের আর্দ্র **মৌসুমী** বায়ু হিমালয়ের গাত্রে বাধা পাইয়া পার্বত অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ করে। দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। উত্তরাংশে কুচবিহারে ৩০০ সে-মি., মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে ২০০ সে-মি., কলিকাতায় ১৬০ সে-মি., বর্ধমানে ১৪০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিকাল বেলায় ঝোড়ো হাওয়া বহে, তাহাকে **কালবৈশাখী** বলে। আশ্বিন মাসে **আশ্বিনের ঝড়** বহে।

**স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**—সমতলভূমিতে আম, কাঁঠাল, লিচু, অশ্বত্থ, বট, ছাতিম, শিমুল, বাঁশ, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর, কলা ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মে। ইহা ভিন্ন, সাবাই ঘাস, উলুখড়, কাশ এবং জলাভূমিতে শোলা, হোগলা, মাদুর-কাঠি ইত্যাদি জন্মে। কুচবিহারে লাল শিমুল গাছ বেশী জন্মে। অশ্বত্থ, বট, বাঁশ, শিমুল প্রভৃতি **পর্ণমোচী** বৃক্ষ।

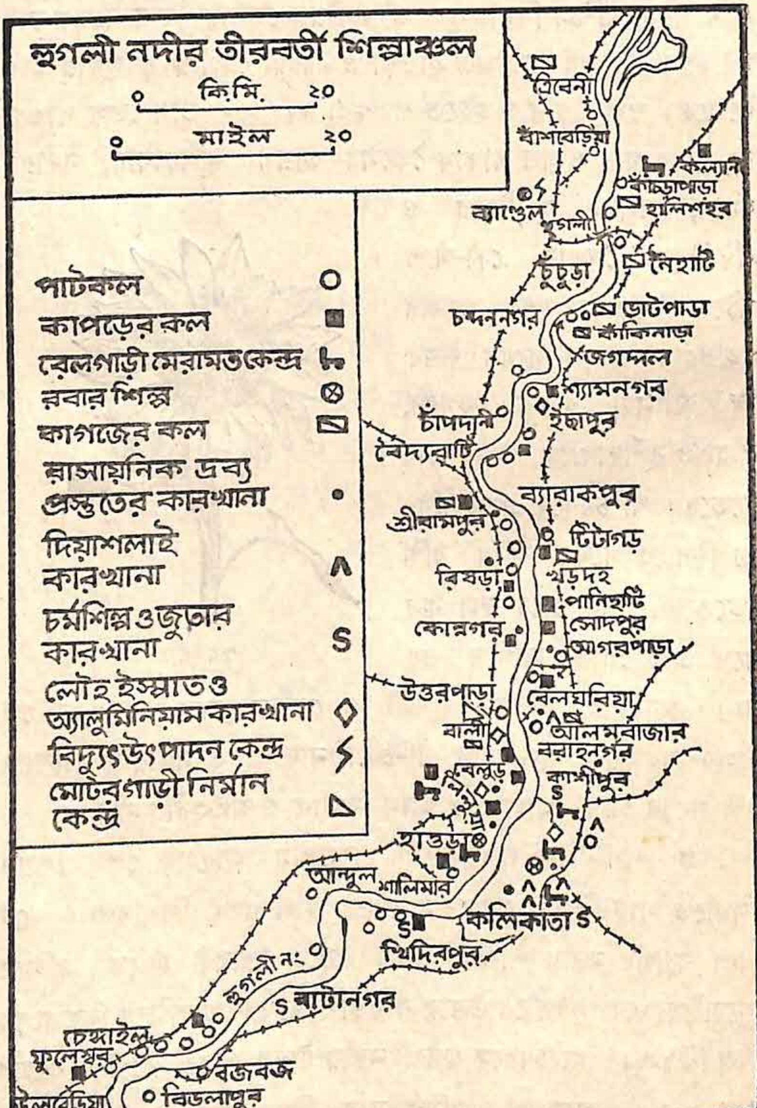
**কৃষিজাত দ্রব্য**—সমতলভূমির পলিমাটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—**বেলেমাটি, এঁটেল মাটি ও দো-আঁশ মাটি**। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমতলভূমির প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেই সময় **ধান, পাট** ইত্যাদি খারিফ শস্যের চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে স্বল্প বারিবর্ষণ হয়, তখন গম, কলাই, তৈলবীজ ইত্যাদি **রবিশস্যের** চাষ হয়। ময়ূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী প্রকল্পে খালের সাহায্যে রাঢ়ভূমিতে সেচকার্য চলিতেছে। ফরাক্কা প্রকল্পে বাগড়ী অঞ্চলে সেচকার্য চলিবে। ইহা ভিন্ন, বরেন্দ্র ভূমিতে খাল, বিল, কূপ ও বড় দীঘির জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য **ধান**। এঁটেল মাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। ধানের পর পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্য **পাট**। ইহাও এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে। আর্দ্র জলবায়ু, মাঝারি ধরনের উত্তাপ পাট চাষের পক্ষে অনুকূল। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর উভয় তীরে, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহারে পাট উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে পাট জাতীয় তন্তু **মেস্তার** চাষও হয়।

মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়া জেলায় **তৈলবীজের চাষ** বেশী হয়। তৈলবীজের জন্য হাওড়া ও নদীয়া জেলায় **সূর্যমুখীর চাষ** হইতেছে। সূর্যমুখীর বীজ হইতে শতকরা ৪০—৫০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়, ইহার স্বাদ ও গন্ধ বাদাম তৈলের ন্যায়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, মালদহ, কুচবিহার ও মেদিনীপুর জেলায় দো-আঁশ মাটিতে **ইক্ষুর** চাষ হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হইতে গমের উত্তম বীজ আনিয়া হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে গমের চাষ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন রবি-শস্য হিসাবে গমের ফলন বৃদ্ধি পাইতেছে। গম চাষে জল কম লাগে এবং পোকা লাগার ভয় কম। কুচবিহার, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের বেলে-মাটিতে **আলুর** চাষ হয়। কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়ায় **তামাক** বেশী উৎপন্ন হয়। মালদহের **আম** বিখ্যাত ও অর্থকরী ফসল।


সূর্যমুখী

শিল্প—**পাট-শিল্প** পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিল্প। পৃথিবীতে পাট-শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**। এই অঞ্চল হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে উত্তরে ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণে উলুবেড়িয়া এবং পূর্বতীরে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটের কলের সংখ্যা ১০১। দামোদর পরিকল্পনার বিদ্যুৎ সরবরাহ, কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে কাঁচাপাট ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির সুবিধা প্রভৃতি এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক। পাট


হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল
০ কি.মি. ২০
০ মাইল ২০
পাটকল
কাপড়ের কল
রেলগাড়ী মেরামত কেন্দ্র
রবার শিল্প
কাগজের কল
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা
দিয়াশলাই কারখানা
চর্মশিল্প ও জুতার কারখানা
লৌহ ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
মোটরগাড়ী নির্মান কেন্দ্র
ত্রিবেনী
বাঁশবেড়িয়া
কল্যানী
কাঁচড়াপাড়া
হালিশহর
ব্যাণ্ডেল
হুগলী
চুঁচুড়া
নৈহাটি
চন্দননগর
ভাটপাড়া
কাঁকিনাড়া
জগদ্দল
শ্যামনগর
চাঁপদানি
ইছাপুর
বৈদ্যবাটি
ব্যারাকপুর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
খড়দহ
পানিহাটি
কোন্নগর
সোদপুর
আগরপাড়া
উত্তরপাড়া
বেলঘরিয়া
বালী
আলমবাজার
বরাহনগর
বেলুড়
কাশীপুর
হাওড়া
আন্দুল
শালিমার
কলিকাতা
খিদিরপুর
হুগলী নং
বাটানগর
চেঙ্গাইল
ফুলেশ্বর
বজবজ
উলুবেড়িয়া
বিড়লাপুর

হইতে ক্যানভাস ব্যাগ, ত্রিপল, কার্পেট, দড়ি, পা-পোষ, ঢাকনার কাপড় ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ারি হয়। পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়া পাটের অভাব পূরণ করা হয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার জন্য পাটজাত দ্রব্যের অধিকাংশই রপ্তানি করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে তূলা খুব সামান্যই উৎপন্ন হয়। তৎসত্ত্বেও এই রাজ্যে কার্পাস বস্ত্র বয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সমতলভূমি অঞ্চলে ৪০টিরও অধিক কাপড়ের কল আছে। এই কলগুলি হুগলী নদীর উভয় তীরে—শ্রীরামপুর, হাওড়া, রিষড়া, কোন্নগর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, পানিহাটী, শ্যামনগর, কল্যাণী, সালকিয়া, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। বিদ্যুৎ সরবরাহ, পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, যাতায়াতের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কারণ বস্ত্র শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে। শান্তিপুর, ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ তাঁত-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

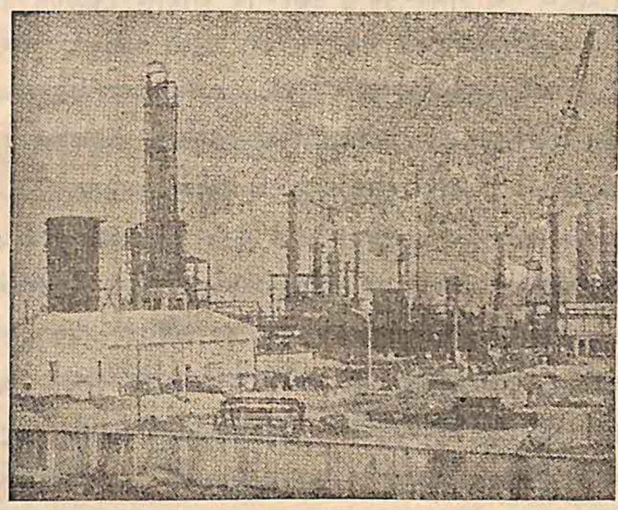
কাগজ শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত। নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, আলমবাজার, বালী, শ্রীরামপুর, ত্রিবেণীতে কাগজের কলগুলি অবস্থিত। হুগলী জেলায় উত্তরপাড়ার নিকট 'হিন্দ্ মোটর' নামক স্থানে 'হিন্দুস্থান মোটরস্' নামক মোটর গাড়ী নির্মাণের বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজের নিকট বাটানগরে চর্ম-শিল্পের একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জুতা নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে ইহা বিখ্যাত। হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়ায় সাহাগঞ্জে 'ডান্‌লপ্' কোম্পানীর বিরাট রবার কারখানা অবস্থিত। এখানে মোটর-গাড়ী ও লরীর টায়ার প্রস্তুত হয়। দক্ষিণেশ্বরে 'উইমকো' নামক একটি দিয়াশলাই তৈয়ারির কারখানা আছে। কাশীপুরে সরকারী বন্দুক ও গোলা তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে। হুগলী জেলায় রিষড়া নামক স্থানে 'এ্যাল্‌ক্যালি কেমিক্যাল

কর্পোরেশনের' এক বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জেলার ব্যাণ্ডেলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। মেদিনীপুর জেলায় কোলাঘাট-এ ২০০ মে-ও. শক্তি বিশিষ্ট তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতে এখান হইতে বিদ্যুৎ মেদিনীপুর, হলদিয়া, খড়গপুর ও বৃহত্তর কলিকাতায় সরবরাহ করা হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলায় 'বেঙ্গল কেমিক্যালের' রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের কারখানা উল্লেখযোগ্য। শালিমারে নানাবিধ রং তৈয়ারির কারখানা আছে।

হাওড়া জেলার লিলুয়াতে এবং ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় রেলের প্রয়োজনীয় নানাবিধ অংশ তৈয়ারি ও মেরামত করা হয়। বেলুড়ে একটি এ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে। হাওড়া জেলায় এবং কলিকাতায় ও ইহার আশেপাশে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাই কল, কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা আছে। খিদিরপুরে (কলিকাতা) নেতাজী সুভাষ ডকে ( পূর্বনাম কিং জর্জ ডক ) একটি বৃহৎ জাহাজ তৈয়ারি ও জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে খিদিরপুর গার্ডেনরীচ কারখানায় বর্তমানে টাগ, ড্রেজার, স্টীমার ইত্যাদি তৈয়ারি হইতেছে। এখানে একটী ২৬ হাজার টনের জাহাজ নির্মাণের কাজ চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় ও নদীয়া জেলার পলাশীতে ইক্ষু-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটাতে একটি দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। হলদিয়া বন্দরে তৈলশোধনাগার ও সার কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক শিল্পের উপাদান এখান হইতে পাওয়া যাইবে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে নগর গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য।

কাঁচ ও মৃৎশিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। মালদহ ও



হলদিয়ায় নির্মীয়মান তৈলশোধনাগার

মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম দিনাজপুরে অনেক চাউলের কল আছে। বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের কাঁসা ও পিতলের বাসন, মেদিনীপুরের মাতুর, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের জিনিস, কুচবিহারের তাঁত-শিল্প ও কাষ্ঠ-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

**জীবজন্তু**—সমতলভূমির স্থানে স্থানে গাছপালায় বানর এবং ঝোপ-ঝাড়ে শৃগাল, বিড়াল জাতীয় খাটাশ, সরীসৃপ ইত্যাদি জীবজন্তু দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, প্রায় সর্বত্র গো, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু রহিয়াছে। কুচবিহারে নানাজাতের পাখী দেখা যায়।

**যাতায়াত ব্যবস্থা**—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃহত্তম কেন্দ্র। রেলপথ, সড়কপথ, বিমানপথ, জলপথ

ইত্যাদি দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের তথা সারা ভারতের সহিত কলিকাতার যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সমভূমির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। দুর্গাপুর-ত্রিবেণী খালের মধ্য দিয়া সমভূমি অঞ্চলের মালপত্র পরিবাহিত হয়। কলিকাতা শহরের যানবাহন সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মিত হইতেছে। হলদিয়ার সঙ্গে কলিকাতা শহরের যোগাযোগের মাধ্যম রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস। সম্প্রতি পাঁশকুড়া হইতে হলদিয়া পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত চলিতেছে।

**অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা**—সমভূমির অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিকার্য ও শিল্পকার্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামাঞ্চলে নানারকম কুটীর শিল্পের কাজে অনেকে নিযুক্ত আছে। তন্তুবায় বা তাঁতী, কর্মকার বা কামার, সূত্রধর বা ছুতার, জেলে, গোয়ালা প্রভৃতি স্ব স্ব জাতিগত পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। পশ্চিম দিনাজপুরে হাঁস-মুরগীপালন অধিবাসীদিগের অন্যতম উপজীবিকা। শহরের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত এবং চাকরিজীবী। কেহ বা ওকালতি, ডাক্তারী ইত্যাদি স্বাধীন ব্যবসায়ী, কেহ কেহ নানারকম ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে। কুচবিহারে কোচ উপজাতির লোকেরা বাস করে, তাহারা প্রধানত কৃষিজীবী। ইহা ভিন্ন, গারো, ওরাওঁ, সাঁওতাল, মেচ প্রভৃতি উপজাতির কিছুসংখ্যক লোকও কুচবিহারে বাস করে। গারো ও মেচ নারীরা নানা রঙের তাঁতবস্ত্র বয়ন করিতে সক্ষম।

**নগর**—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা (উপকণ্ঠাদিসহ জনসংখ্যা ৭০'৪০ লক্ষ) সমুদ্র হইতে ১২৮ কি-মি. অভ্যন্তরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর, পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শহর এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

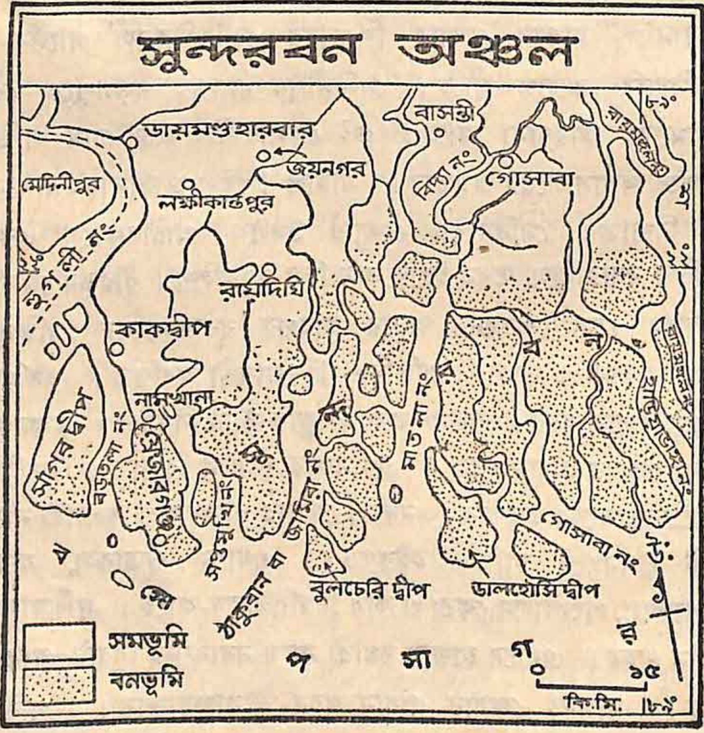
কলিকাতার উপকণ্ঠে **দমদম** আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন। ফোর্ট উইলিয়ম, রাজভবন, যাদুঘর, তেরতলা সরকারী দপ্তরখানা, হাইকোর্ট, সংসদ ভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ, বিড়লা তারামণ্ডল ইত্যাদি অনেক দ্রষ্টব্য স্থান কলিকাতায় আছে।

হুগলী জেলার কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান। হাওড়া জেলার শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। মেদিনীপুর জেলার **খড়গপুরে** রেল মেরামতের কারখানা আছে। এই জেলার **বীরসিংহ** গ্রাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান। **ঘাটাল** পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত। মেদিনীপুর জেলার **তমলুক** প্রাচীনকালে একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তখন ইহার নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। বীরভূম জেলায় **বোলপুর** রেল স্টেশনের অদূরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত **শান্তিনিকেতন** ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত **বিশ্বভারতী** অবস্থিত। **বর্ধমান** জেলার প্রধান শহর। কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি বিখ্যাত। **কৃষ্ণনগর** নদীয়া জেলার প্রধান শহর। এখানকার মৃৎশিল্প বিখ্যাত। **নবদ্বীপ** শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে **কল্যাণী** নামে একটি উপনগরী স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সুতাকল, যক্ষ্মা-হাসপাতাল, পশুপালন কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **মুর্শিদাবাদ** প্রাচীন শহর। এখানে হাজার দুয়ারী নামে নবাবদের বিরাট প্রাসাদ আছে। মালদহ জেলার প্রধান শহর **ইংরাজবাজার**। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান শহর **রায়গঞ্জ**। ইহা পাট ও তামাকের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। **কুচবিহার** জেলার প্রধান শহর। এখানকার মহারাজার প্রাসাদ, মদনমোহনের মন্দির ও ভিক্টোরিয়া কলেজ দেখিবার জিনিস।

## চতুর্থ পাঠ

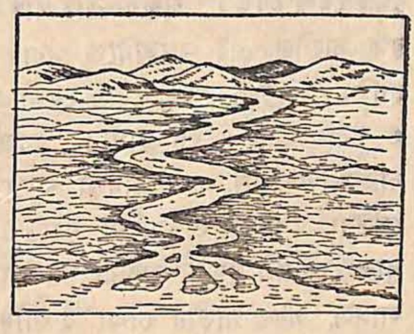
# (ক) সুন্দরবন অঞ্চল

**প্রাকৃতিক বিবরণ**—২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রায় ৪.২ হাজার বর্গ কি-মি. স্থান ব্যাপিয়া যে অরণ্যময় নিম্নভূমি আছে উহার নাম সুন্দরবন।




এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষ সুন্দরীর নাম হইতে সুন্দরবন নাম হইয়াছে। পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পূর্বে রায়মঙ্গল নদীর মোহানা পর্যন্ত এই বনভূমি বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন ভূমি এতই নিম্ন যে সমুদ্রের জোয়ারের সময় ইহার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়া যায়। ভাঁটার সময় আবার ডাঙ্গা জাগিয়া উঠে।

সুন্দরবনে অসংখ্য খাঁড়ি, খাল, জলাভূমি, চর ও ছোটবড় দ্বীপ আছে। **সাগর দ্বীপ** সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ফ্রেজারগঞ্জ এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। ইহা ব্যতীত, দক্ষিণাংশে আছে লোনা জলের বহু উপহ্রদ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও স্বাভাবিক বাঁধ। নদীর গতিপথে পলিমাটি ও বালির চর থাকিলে নদী সাধারণত আঁকিয়া-বাঁকিয়া-চলে।



নদীর বক্রগতি

**সপ্তমুখী**, **জামিরা**, **মাতলা**, **গোসাবা**, **হাঁড়িয়াভাঙ্গা**, **রায়মঙ্গল** প্রভৃতি নদী সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। নদীগুলির উভয় তীরে নিবিড় অরণ্য। ইহাদের অগভীর ও প্রশস্ত মোহানাগুলিকে খাঁড়ি বলা হয়।

**জলবায়ু**—সুন্দরবন অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সমুদ্র নিকটে থাকিবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের তারতম্য ৯।১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। সাগরদ্বীপে গ্রীষ্মকালে গড় তাপ ২৮° সে., শীতকালে গড় তাপ ২০° সে.। শীতকালে বায়ু কিছু শুষ্ক থাকে, কিন্তু শীতকাল অল্পস্থায়ী। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নিম্ন উপকূলে ঝড়বৃষ্টি হয় মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী। সুন্দরবন অঞ্চলে গড়ে ২০৪ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। বৈশাখ মাসে **কালবৈশাখী** এবং আশ্বিনমাসে **আশ্বিনে-ঝড়** হয়। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং উহাতে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়।

**স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**—সুন্দরবনের জলমগ্ন নিবিড় অরণ্যে সুন্দরী বৃক্ষই বেশী জন্মে। সুন্দরী কাঠ গাঢ় লাল, শক্ত ও মূল্যবান। সুন্দরী বৃক্ষ ব্যতীত এই বনভূমিতে গরাণ, গর্জন, শিমুল, গেঁউয়া, জারুল, ছাতিম, পিটুলী, বাঁশ, বেত, কেয়া প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে। গর্জন ও গরাণ কাঠ যথেষ্ট দামী। গরাণ কাঠে খুঁটি এবং এই গাছের বাকল-ভিজানো জলে চামড়া কষানো ( tanning ) হয়। শিমুল, গেঁউয়া, পিটুলী ও ছাতিম কাঠে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও প্যাকিং বাক্স তৈয়ারি হয়। সুন্দরবনের কাঠের দ্বারা আসবাবপত্র, নৌকা, লাঙ্গল, গরুর-গাড়ীর চাকা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। কলকারখানার প্রয়োজনেও এই বনভূমির কাঠ ব্যবহৃত হয়। নানারকম কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত, এই বনে প্রচুর গোলপাতা ও হোগলা জন্মে। এইগুলি এই অঞ্চলের লোকদের ঘরের ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে নারিকেল, সুপারি গাছও জন্মে। ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বর্তমানে ঝাউ গাছের চারা লাগানো হইতেছে।

সুন্দরবন হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান কাঠ, বাঁশ, গোলপাতা, হোগলা, নারিকেল, মোম ও মধু সংগ্রহ করা হয়। এই অরণ্য হইতে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয় বলিয়া ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বলা যায়। সুন্দরবনের বনজ সম্পদ হইতে প্রতিবৎসর সরকারের আয়বৃদ্ধি হইতেছে। সুন্দরবনের কাঠের বাজার আছে কলিকাতা, ক্যানিং, হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থানে। কাগজ ও দিয়াশলাইয়ের কাঠি নির্মাণের কাঁচামাল এই অরণ্যে রহিয়াছে। অরণ্যসম্পদকে শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারিলে এই বনাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হইবে। সুতরাং এই বনভূমির সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

**কৃষি ও শিল্প**—সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিকার্য উন্নত নহে। সাগরের লোনা জল জমিতে প্রবেশ করিয়া চাষ-আবাদের ক্ষতি সাধন করে।

রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি সংস্থা ( বোর্ড ) গঠন করিয়াছেন। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধের সাহায্যে লোনা জল আটক করিয়া কিছু ধানের চাষ হইতেছে। এখানে তূলার চাষও হইতেছে। সুন্দরবনের লোনা মাটি ও জলবায়ু নারিকেল চাষের উপযোগী। নারিকেল চাষ বৃদ্ধি পাইলে এখানে ভবিষ্যতে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

বনভিত্তিক শিল্প গড়িয়া উঠিবারও যথেষ্ট সুবিধা এই অঞ্চলে আছে। কাগজশিল্পের কাঁচামাল নরম কাঠ এই বন হইতে পাওয়া যাইবে। মূলধন, বিদ্যুৎ ও উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা এই অঞ্চলের শিল্পের সহায়ক হইবে। বিদ্যুৎ গবেষকদের মতে সুন্দরবনের নদীগুলির খাঁড়িসমূহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস। খাঁড়িগুলির জোয়ার-ভাঁটা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হইবে। সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলের বকুলতলায় এবং তথা হইতে ৯ কি-মি. উত্তর-পশ্চিমে লক্ষ্মীকান্তপুরে তৈল সন্ধানের কাজ চলিতেছে। বিদ্যুৎ ও তৈল উৎপাদনের প্রচেষ্টা ফলবতী হইলে অদূর ভবিষ্যতে বনাঞ্চল শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

সমুদ্রোপকূলের নিকট খাঁড়িগুলিতে ইলিশ, পার্শে, ভেটকি, তপসে, গুর্জালি, চিংড়ি ( Prawns ), পমফ্রেট ইত্যাদি মাছ ধরিবার সুযোগ ( Estuarine Fisheries ) আছে। ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার, কুলপি, নামখানা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি মৎস্য শিকার কেন্দ্র। রাজ্য সরকারের গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার প্রকল্প অনুযায়ী ডায়মণ্ডহারবারে হিমঘর ও মৎস্যের খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে নানাজাতের প্রচুর মাছ ধরিয়া কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের বাজারে পাঠানো হয়। বাঁধের সাহায্যে সুন্দরবন অঞ্চলে মাছের ভেড়ি নির্মাণ করিয়া মাছের চারার চাষ চলিতেছে।

**যাতায়াত ব্যবস্থা**—সুন্দরবন অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা এখনো সন্তোষজনক নহে। ডায়মণ্ডহারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইলে এই অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হইবে। বজবজ হইতে নামখানা পর্যন্ত ৮২ কি-মি. রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবনা চলিতেছে। শিকার ও ভ্রমণক্ষেত্র হিসাবে সুন্দরবন বড়ই আকর্ষণীয়। কলিকাতা হইতে রেলপথে অথবা সড়কপথে বাসে ডায়মণ্ড-হারবার যাওয়া যায়। মোটরলঞ্চে জলপথেও ডায়মণ্ডহারবার হইয়া সাগরদ্বীপে যাইবার সুবিধা আছে। ডায়মণ্ডহারবার হইতে কাকদ্বীপ হইয়া বাসে নামখানা যাইবার পর ফেরী পার হইয়া ফ্রেজারগঞ্জে যাইতে হয়। কাকদ্বীপ হইতে নৌকায় ও লঞ্চে সাগরদ্বীপে যাওয়া যায়। ফ্রেজারগঞ্জ হইতে লঞ্চ বা নৌকায় চড়িয়া বেড়াইবার সময় সাগর হইতে বনভূমির মনোরম দৃশ্য এবং নানাজাতের জীবজন্তু দৃষ্টিগোচর হয়।

**জীবজন্তু**—বন্যজন্তুর আবাসভূমি হিসাবে সুন্দরবন একটি উল্লেখ-যোগ্য অঞ্চল। সুন্দরবনে যে সকল জন্তু বাস করে তাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রই সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর। ইহাদের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে। নিবিড় অরণ্যে বাঘ, শূকর, চিতল হরিণ, কুকুরে হরিণ, সজারু, বনবিড়াল, বানর, সর্পাদি সরীসৃপ, গোসাপ এবং জলাভূমিতে কুমীর দেখা যায়। ইহা ভিন্ন, নানা জায়গা হইতে নানা জাতের পাখী আসিয়া এই বনভূমিতে আশ্রয় নেয়। রাজ্য সরকারের ব্যাঘ্র-প্রকল্প অনুযায়ী সুন্দরবনের ব্যাঘ্র সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি দ্বীপে সম্প্রতি অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাযাবর পাখীদেরও একটি উপনিবেশ আছে সজনেখালিতে।

**অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা**—সুন্দরবন অঞ্চলে নিবিড় অরণ্যের কতক অংশ ব্যতীত সজনেখালি, রাঙাবালি, গোসাবা, হাঁড়িয়াভাঙা ইত্যাদি স্থানে অনেক গাছ কাটিয়া বন পরিষ্কার করিয়া

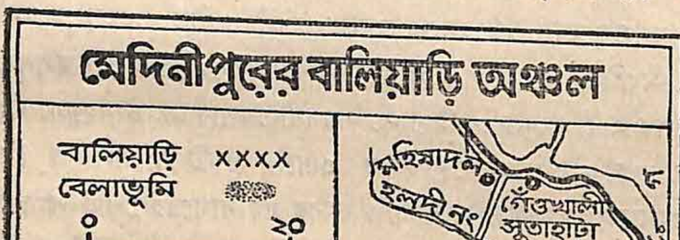
মনুষ্য বসতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ২২ লক্ষ লোক সুন্দরবন অঞ্চলে বাস করিতেছে। অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী, বাগ্‌দী, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির লোকেরাও এখানে বাস করে। ইহারা গরীব, ইহাদের বাড়িঘর কাঠের দ্বারা নির্মিত এবং চালে গোলপাতা ও হোগলার ছাউনি। নানারকম কুটীর শিল্প, নৌ-চালনা, মৎস্য শিকার, মধু ও মোম সংগ্রহ, চাষবাস প্রভৃতি এখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা।

**প্রসিদ্ধ স্থান**—ডায়মণ্ডহারবার হুগলী নদীর মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর। ইহা কলিকাতার সহিত সড়কপথ, জলপথ ও রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। ইহা ২৪ পরগনা জেলার একটি মহকুমা শহর। রাজ্যসরকার ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে একটি ট্যুরিস্ট লজ্ নির্মাণ করিয়াছেন। সাগরদ্বীপে প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগরের পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয়। এখানে কপিল মুনির মন্দির আছে। ভ্রমণকারীরা প্রতিবৎসর সুন্দরবনের দৃশ্য দেখিবার জন্য যাতায়াত করেন বলিয়া এই অঞ্চলে ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালিতে **পর্যটন শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পের উন্নতির জন্য সাগরদ্বীপ ও কলিকাতার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

## (খ) মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলের বালিয়াড়ি অঞ্চল

**প্রাকৃতিক বিবরণ**—মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগরের বালুকাময় তটভূমিতে বালিয়াড়ি অঞ্চল অবস্থিত। তীর সংলগ্ন এই নিম্নভূমি প্রায়ই লোনা-জলমগ্ন থাকে। ৫৬ কি-মি. দীর্ঘ এই সমুদ্রোপকূল অভগ্ন, এখানে কোন দ্বীপ নাই, কিন্তু অসংখ্য বালিয়াড়ি ( Sand Dune ) আছে। কখনো কখনো সমুদ্র-বায়ুপ্রবাহে বালুকারাশি সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ির বাঁধের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের উপকূলে বালি, পলি ও লবণ মিশ্রিত

মৃত্তিকা দেখা যায়। জুনপুটের নিকটে বালির বাঁধের দ্বারা একটি উপহ্রদের ( লেগুন ) সৃষ্টি হইয়াছে। বালিয়াড়ি অঞ্চল উপকূল হইতে পশ্চিমে হিজলি খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১১ কি-মি. পর্যন্ত অভ্যন্তরে বালিয়াড়ি দেখা যায়। দীঘায় বালিয়াড়ির সম্মুখে একটি প্রশস্ত সমভূমি আছে। ইহাকে সৈকত ভূমি ( Beach ) বলা হয়। সমুদ্র-সৈকতে বালিয়াড়ির গতিরোধ করিবার জন্য ক্যাসুরিনা ঝাউ গাছ




রোপণ করা হইয়াছে। রসুলপুর নদী বালিয়াড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

**জলবায়ু**—সমুদ্রের প্রভাবে এই অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। এখানে গ্রীষ্ম ও শীতের তীব্রতা কম। শীতকালে সমুদ্রের গরম বাতাস এবং গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের শীতল বাতাস স্থলভাগের দিকে

বহিতে থাকে। এখানে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সে-মি.।

**স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ**—মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলের লোনা মাটিতে নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর, কাজু-বাদাম প্রভৃতি পামজাতীয় গাছ জন্মে। এখানে ক্যাসুরিনা ঝাউগাছের বন আছে। এই গাছের কাঠ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

**কৃষি ও শিল্প**—বালিয়াড়ি অঞ্চল হইতে কিছুদূর অভ্যন্তর ভাগে চাষ আবাদ হয়। ধান ও তরমুজ কৃষিজাত দ্রব্য। রামনগরে সমুদ্রের জল হইতে লবণ তৈয়ারি হয়। জুনপুটে মৎস্য বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে হাঙ্গরের যকৃত হইতে তৈল উৎপাদন করা হয়। দীঘা হইতে জুনপুট পর্যন্ত সমুদ্রে মৎস্য ও হাঙ্গর শিকার করা হয়।

**যাতায়াত ব্যবস্থা**—খড়্গপুর হইতে বাসে এই অঞ্চলের বড় শহর কাঁথিতে যাওয়া যায়। কাঁথি হইতে দীঘায় যাইবার পথ নির্মিত হইয়াছে। আজকাল কলিকাতা হইতে দীঘায় বাসে যাওয়া যায়।

**অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা**—সমুদ্রতটের বালিয়াড়ি অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। তবে কাঁথি মহকুমার সদর শহর বলিয়া এখানে লোকবসতি কিছু বেশী। সমুদ্রোপকূলের নিকটে কিছু সংখ্যক জেলে ও চাষী বাস করে। মৎস্য শিকার, কৃষিকাজ ও কুটীর শিল্প ইহাদের উপজীবিকা।

**প্রসিদ্ধ স্থান**—দীঘা একটি নূতন স্বাস্থ্য নিবাস ও পর্যটন কেন্দ্র। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে দীঘার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য গৃহ নির্মাণ, পথ সম্প্রসারণ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

# তৃতীয় অধ্যায়

# উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সরকার সাধারণত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কৃষি, পরিবহন ইত্যাদির উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা পরিকল্পনার লক্ষ্য। বস্তুত, পরিকল্পিত কর্মসূচী ব্যতীত উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ইত্যাদি কোনরূপ কার্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচীর রূপায়ণে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কিরূপ অগ্রগতি হইয়াছে তাহা অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

## প্রথম পাঠ

## জলসেচ

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৫৭.৫ জনের উপজীবিকা কৃষিকার্য। এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের দান অপরিসীম। সুতরাং কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্ব অত্যধিক। কৃষিকার্যের প্রধান উপাদান জল। পশ্চিমবঙ্গে চাষ-আবাদ প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সকল সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না এবং বৃষ্টির পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। কোথাও স্বল্পবৃষ্টি, কোথাও বা অতিবৃষ্টি হয়। বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক কম। এই সকল

কারণে পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের কাজ চালানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে চাষ-আবাদ হয়। কৃষিযোগ্য জমির শতকরা ২৬ ভাগ জলসেচের সুবিধা পায়। অনেক জায়গায় কূপ বা গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচের কাজ করা হয়। আবার কোন কোন জায়গায় বিদ্যুৎ চালিত নলকূপ বা খালের জল দ্বারা সেচের কাজ চলিতেছে। চতুর্থ যোজনার শেষ বৎসর হইতে এই রাজ্যে ৬,৪০০-এর অধিক ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে জমিতে জলসেচ হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ও ৪০টি মাঝারি নিষ্কাশন খাল প্রকল্প ( Drainage Scheme ) গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমতা জলনিকাশ প্রকল্প, সোনারপুর-আরাপাঁচ জলনিকাশ প্রকল্প, বাগজোলা-ঘুনী-যাত্রাগাছি জলনিকাশ প্রকল্প, মেদিনীপুরের তুবদা অববাহিকা প্রকল্প, মালদহের মহানন্দা জলনিকাশ প্রকল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া জেলার শুভঙ্কর দাঁড়া সেচ প্রকল্পে ২,৪৩০ হেক্টেয়ার* জমিতে জল সরবরাহ হইতেছে। সোহারাজোড় সেচ প্রকল্পের দ্বারা পুরুলিয়া জেলায় ৪,৮৫০ হেক্টেয়ার জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও অনেকগুলি জলনিকাশ প্রকল্প কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে কূপ, জলাশয়, খাল ইত্যাদি মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প দ্বারা ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে সেচ দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খাল, হিজলি খাল, বর্ধমান জেলার দামোদর খাল, বর্ধমান ও হুগলী জেলার ইডেন খাল, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর খাল, বাঁকুড়া জেলার শালবাঁধ খাল,

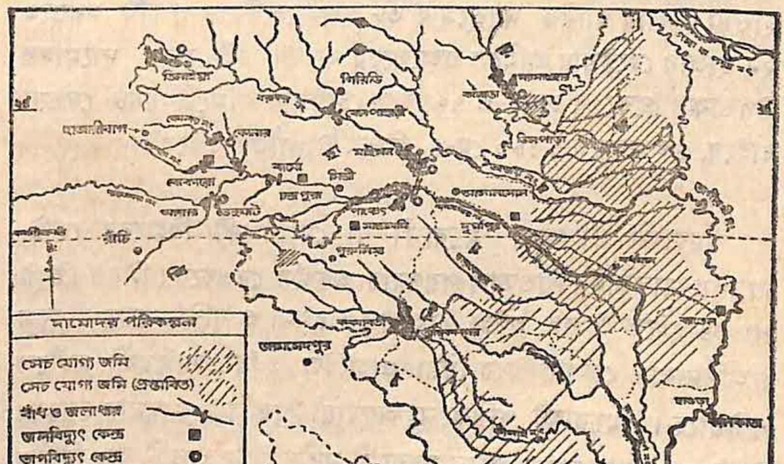
* ১ হেক্টেয়ার = ২·৫ একর

প্রভৃতি কয়েকটি পুরাতন খালের সাহায্যে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির তুলনায় এই সমস্ত খালের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী (১৯৬৭-'৬৮ খ্রীস্টাব্দে) পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৫ লক্ষ ৪২ হাজার হেক্টেয়ার। দো-ফসলী কৃষি-জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার হেক্টেয়ার। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে সরকারী ও বেসরকারী খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে সেচ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩.১৬ লক্ষ হেক্টেয়ার। পঞ্চম যোজনার কর্মসূচীর রূপায়ণে সেচ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রসার লাভের আশা করা যায়। এই রাজ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কৃষির ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৭৬-'৭৭ খ্রীস্টাব্দে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ খাতে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ হইতে পর্যায়িত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কয়েকটি নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করাই নদী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। গঠনমূলক কার্যের মধ্যে নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিসংরক্ষণ, জলসেচ, জলস্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, খালে নৌ-চলাচল, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, মৎস্যের চাষবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রধান। এইরূপ পরিকল্পনাকে **বহুমুখী নদী পরিকল্পনা** (Multipurpose River Project) বলা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব হইতেই ভারত সরকার **দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন** (ডি. ভি. সি.) নামক এক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার

তত্ত্বাবধানে এই বহুমুখী পরিকল্পনার কাজ গ্রহণ করেন। দামোদর নদ ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ জেলার খামারপাত নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বর্ধমান শহর পর্যন্ত পূর্বমুখী, পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া দামোদর কলিকাতার দক্ষিণে ফলতার বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। বর্ষাকালে দামোদর ও ইহার উপনদীগুলিতে এত অধিক পরিমাণে জল হয় যে উহাতে বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ধ্বংসাত্মক বন্যা নিবারণের জন্য দামোদর নদ-উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায়




দামোদর ও উহার উপনদী সমূহের উপর দশটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। দামোদরের উপর পাঞ্চেৎ পাহাড়, বার্মো ও আয়ার; বরাকরের উপর তিলাইয়া, মাইথন ও বেল-পাহাড়ী; কোনারের উপর তিনটি এবং বোকারোর উপর একটি

বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। বর্ধমান জেলার তুর্গাপুরে একটি সেচবাঁধ বা ব্যারেজ তৈয়ারি হইয়াছে। ব্যারেজের নিকট হইতে নদীর তুইপার্শ্বে খাল কাটিয়া পরিবহন ও জলসেচ উভয়বিধ কার্য চলিতেছে। তুর্গাপুর হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত প্রায় ১৩৭ কি-মি. দীর্ঘ খালের সাহায্যে পরিবহন কার্য চলিতেছে। সম্প্রতি আয়ার নদীর উপর তেলুঘাটে একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। বোকারো, তুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় তিনটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কোনার, তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের দ্বারা বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় খারিফ মরসুমে ৩·৩৮ লক্ষ হেক্টেয়ার ও রবি মরসুমে ২২ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের দ্বারা ৩·৭০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে, এই প্রকল্পে ১,১৮১ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে।

**ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা**—ময়ূরাক্ষী বা মোর নদী বিহারের ছোট-নাগপুর মালভূমির সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাঁওতাল পরগনা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নদীতে পড়িয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগনার তুমকার নিকট মাসাঞ্জোর নামক স্থানে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। কানাডা সরকারের সহায়তায় ইহা নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কানাডা বাঁধ বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি সেচবাঁধ বা ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদীতে চারিটি ছোট ছোট ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। তিলপাড়া

ব্যারেজের দুই দিকের খালের সাহায্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রায় ২·৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।



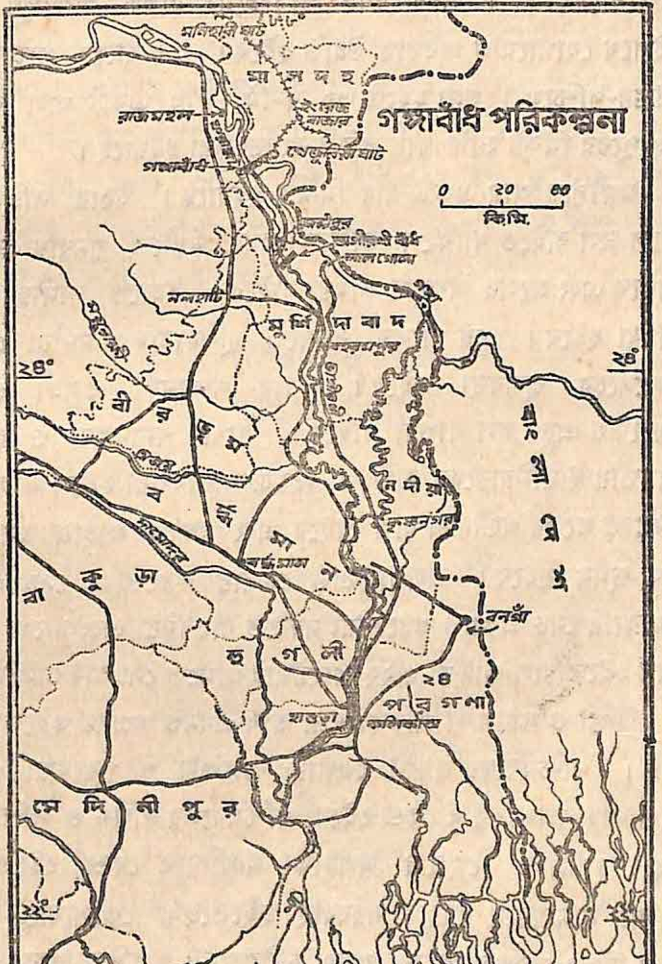

ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের দ্বারা ৪ মে-ও. জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে।

**কংসাবতী পরিকল্পনা**—কংসাবতী নদী পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্তে ছোটনাগপুরের পার্বতভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। ইহা একটি জলসেচ প্রকল্প। কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের কাজ বাঁকুড়া জেলায় আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কংসাবতীর উপনদী

কুমারী নদীর উপর অম্বিকা নগর নামক স্থানে একটি বাঁধ এবং পুরুলিয়ায় কংসাবতীর উপর অপর একটি বাঁধ ও একটি জলাধার নির্মিত হইতেছে। সেচ খাল কাটা হইয়াছে। খালগুলির দুই তীর সিমেণ্ট ও কংক্রীট দ্বারা বাঁধানো হইয়াছে ; জল নির্গমনের পথ তৈয়ারি হইবে। বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হইলে এই প্রকল্পের দ্বারা পশ্চিম-বঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে ৪·০২ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে।

**গঙ্গা বাঁধ বা ফরাক্কা পরিকল্পনা**—গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে বলিয়া গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথী ক্রমশ মজিয়া যাইতেছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ইহা গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ফলে ভাগীরথী স্রোতোহীন ও ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার তলদেশে পলি ও মাটি জমিতেছে। অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদী বালি, কাদা, মাটি প্রভৃতি আনিয়া হুগলী নদীতে ভাগীরথীর দক্ষিণাংশে ফেলে। ইহাতে নদীতে মাঝে মাঝে চর পড়ায় কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আসিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ড্রেজার যন্ত্রে মাটি কাটিয়া পাইলট ষ্টীমারের সাহায্যে জাহাজকে কলিকাতা বন্দরে আনিতে হয়। জলের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় নদীর জলে লবণের অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং কলিকাতায় পানীয় জল লবণাক্ত হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহাই ফরাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের উপর দিয়া ব্রডগেজ রেলপথে ও কংক্রীটের তৈয়ারি রাজপথে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সহিত উত্তরাংশের সরাসরি যোগাযোগ এবং উত্তর বিহার, আসামের সঙ্গে


গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা
মনিহারী ঘাট
রাজমহল
মা ল দ হ
0 20 40
কিমি.
লালগোলা
নলহাটি
মু র্শি দা বা দ
বহরমপুর
বী র ভূ ম
ন দী য়া
কৃষ্ণনগর
ব র্দ্ধ মা ন
বর্দ্ধমান
বা কু ড়া
বনগাঁ
হু গ লী
২৪ প র গ ণা
হাওড়া
কলিকাতা
মে দি নী পু র

সংযোগ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আসামের চা ও অরণ্যসম্পদ পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। এইপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। এই বাঁধের পশ্চাদ্‌ভাগে (উত্তর-পশ্চিমে) গঙ্গা হইতে ৩৯ কি-মি. দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়া জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে।

জঙ্গীপুরে আর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার সহিত যুক্ত খালে জল বহিতে থাকিলে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পুনরায় জলবৃদ্ধি পাইবে এবং জলের লবণতা কমিয়া যাইবে। ইহাতে পানীয় জলের সুবিধা হইবে। এই খালের সাহায্যে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচের সুব্যবস্থা হইবে। পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী ও চূর্ণী নদীতেও প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। বাঁধের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব। ইহা দ্রুত কার্যকরী হইলে কলিকাতা বন্দরের জলের গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বন্দরে জাহাজ আসিবার পথ সুগম হইবে। জলপাইগুড়ি জেলায় **করতোয়া** সেচ প্রকল্পে (মাঝারি সেচ প্রকল্প) করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়া এবং বাঁধের উভয় পার্শ্ব হইতে খাল কাটিয়া ৫,২২০ হেক্টেয়ার জমিতে সেচকার্য চলিতেছে।

**তিস্তা ও মহানন্দা পরিকল্পনার** কার্য এখনও অগ্রসর হইতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় **ব্যাণ্ডেল** ও পুরুলিয়া জেলায় **সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎ** কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে এবং দার্জিলিং জেলায় **জলঢাকা জলবিদ্যুৎ** কেন্দ্র হইতে এই জেলার নানাস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। কোলাঘাটে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যের ৯,৫৭৭টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হইয়াছে।

ভবিষ্যতে ফরাক্কাতে একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোনা-জল নিষ্কাশন করিয়া চাষ-আবাদের জন্য জমি সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বিনা সেচে ঐ সকল জমিতে চীনাবাদাম, তূলা ও সূর্যমুখীর চাষ হইতেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য পতিত জমি উদ্ধার করিয়া কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও কেলেঘাই অঞ্চলে এইরূপ দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

## দ্বিতীয় পাঠ

# বন্যা নিয়ন্ত্রণ

পশ্চিমবঙ্গের অনেক নদীর তলদেশ পলিমাটিতে ভরাট হওয়ায় ইহাদের স্রোতোবেগ কমিয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন নদী মজিয়া গিয়াছে। নদীর উৎসস্থল পার্বত ভূমিতে বর্ষাকালে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে জল বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে নদী সমভূমিতে প্রবাহিত হইবার সময় দুই কূল প্লাবিত করিয়া এক ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তার বন্যা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বন্যার ফলে নুড়ি, বালি ও কাঁকর মিশ্রিত মৃত্তিকা আসিয়া চাষের জমি ও উৎপন্ন শস্য নষ্ট করে। মহামারী, ব্যাধি ও পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়। এই অভিশাপ হইতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারত আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। তথাপি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিয়া জলাধার ও জল নিকাশের জন্য খাল নির্মাণ করা হইয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবার জন্য

রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ( State Flood Control Board ) আছে। বন্যা সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিবার জন্য জলপাইগুড়িতে একটি কেন্দ্র ( The Flood Forecasting and Warning Centre ) স্থাপিত হইয়াছে। ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য ভারতের পূর্ব উপকূলে রাডার যন্ত্র বসানো হইয়াছে। নদীর পাড় রক্ষা করিবার জন্য পাথর বসাইয়া এবং খাল কাটিয়া নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার তিস্তা নদীর বাম তীরের কিছু জমি রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ তৈয়ারি হইয়াছে। বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চল সমূহে জল নিকাশী খাল তৈয়ারি করিয়া বন্যারোধের চেষ্টা চলিতেছে। প্রয়োজন অনুসারে মজা নদী ও খালের পলি তুলিয়া ফেলিলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কতকটা সম্ভব হয়। পার্বত অঞ্চলে নদীর উৎসস্থানের নিকটে ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে নদীতে পলিমাটি জমিয়া নদীখাত ভরাট হইতে পারে না। ইহাতেও বন্যারোধ করা সম্ভব হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কার্যসূচী লওয়া হইয়াছে—যেমন, কুচবিহারের তোর্সা নদীর বাঁধ, জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার বাঁধ, দোমহনীতে তিস্তা নদীর বাঁধ, বর্ধমান জেলার কালনায় ভাগীরথীর দক্ষিণ পাড়ের সংরক্ষণ বাঁধ, হুগলী জেলায় চুঁচুড়ার মল্লিকঘাটের নিকট হুগলী নদীর দক্ষিণ পাড়ের সংরক্ষণ বাঁধ, জলপাইগুড়ি শহরের করাল নদের বাঁধ, মালদহ জেলার মহানন্দা বাঁধ, ২৪ পরগনা জেলার ইছামতী নদীর বাঁধ, বালুরঘাট শহরের সংরক্ষণ বাঁধ প্রভৃতি।

নদীতে বাঁধ দিয়া নদীর বাড়তি জলকে বাঁধিয়া রাখিয়া জলের বিরাট আধার তৈয়ারি করিয়া বন্যানিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাঁধে সঞ্চিত জলের দ্বারা জমিতে সেচের কাজও চলে। সুন্দরবনে বাঁধের সাহায্যে

সমুদ্রের লোনা জল হইতে জমিগুলিকে রক্ষা করা হয়। আবার বৃষ্টির ফলে জমিগুলিতে জল জমিয়া থাকিলে স্লুইস্ গেটের (Sluice gate) মধ্য দিয়া সুবিধামত জল নিষ্কাশন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় রাজ্যসরকার ১৫টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৭টির কাজ শেষ হয় ১৯৫৫-'৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ফলে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের ৩২·৮ হাজার হেক্টেয়ার জমি বন্যার কবল হইতে মুক্ত হয়। জলনিকাশী প্রকল্প সমেত ৭৪টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মধ্যে ৬৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শেষ হইয়াছে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল (১৯৬১—'৬৬) পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ৬৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমি বন্যার উৎপাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৫·৫৮ কোটি টাকা। ১৯৭২-'৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বন্যা-নিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি বন্যাপীড়িত রাজ্যসমূহে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ১২ বৎসর মেয়াদী বড় রকমের পরিকল্পনা (বা মাস্টার প্ল্যান) গ্রহণ করিবার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। ১৯৭৬—'৭৭ খ্রীস্টাব্দের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

## তৃতীয় পাঠ

## পরিবহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বনজ,

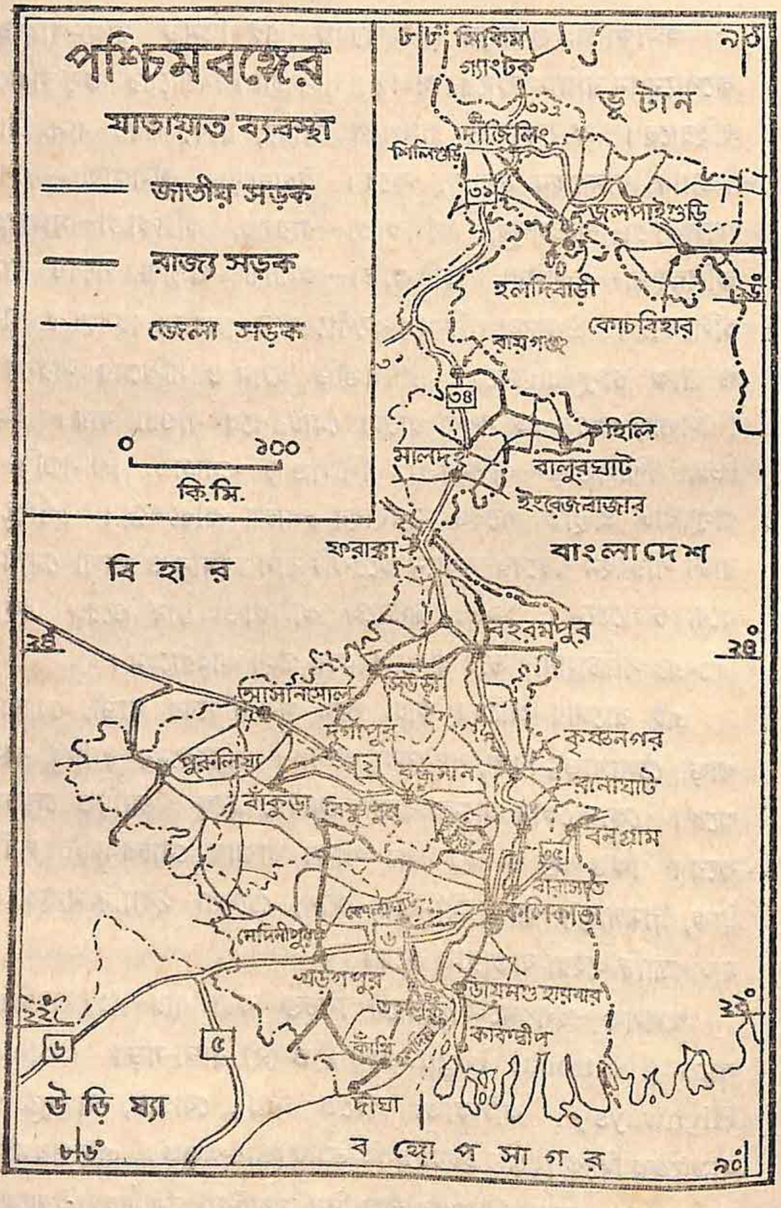
খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে লইয়া যাওয়ার নাম **পরিবহন**। ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিসন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করিবার অন্যতম প্রধান উপায়। মানুষ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন যানবাহনের সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। আবার ডাক ও তার, টেলিফোন, বেতার ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ দূর দেশে বার্তা প্রেরণ, পরস্পর ভাব বিনিময় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। শিল্পোন্নতি, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় সাহায্য দান, যুদ্ধের সময় সৈন্য চলাচল, প্রতিবেশী রাজ্য বা রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন, দেশরক্ষা প্রভৃতি নির্ভর করে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারত সরকার পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শিল্পবাণিজ্যে পল্লী-অঞ্চলসমূহের সহিত শহরগুলির যোগাযোগ রক্ষার জন্য নানারকম যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পথঘাট-সমূহের উন্নতি ও বিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবহন কর্মসূচীতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে। সড়ক ও পরিবহন উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার তৃতীয় যোজনা পর্যন্ত প্রায় ২৬·২০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯৭১-'৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রিক্সা, সাইকেল, মোটর, লরী, বাস, মিনিবাস, জীপ, টেম্পো ইত্যাদি নানারকম যানবাহন চলাচল করিবার মত সড়ক নির্মিত হইয়াছে ৫৩,২৭৪ কি-মি· এবং বিবিধ যানবাহনের সংখ্যা ছিল মোট ১,৯০,২৭৯।

কলিকাতা, দুর্গাপুর ও উত্তরবঙ্গ—এই তিনটি রাজ্য-পরিবহন কর্পোরেশন রাজ্যসরকারের স্বরাষ্ট্র ( পরিবহন ) বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। কলিকাতার রাজপথে মোটর, ট্রাক, লরী, বাস, ট্রাম ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করে। ইহাছাড়া, কলিকাতা—দীঘা, কলিকাতা—বহরমপুর, কলিকাতা—রায়গঞ্জ, কলিকাতা—মালদহ, কলিকাতা—পুরুলিয়া, কলিকাতা—কল্যাণী প্রভৃতি পথেও বাস চলিতেছে। উত্তরবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশনের অধীনে বহুসংখ্যক বাস ও ট্রাক চালু রহিয়াছে। শিলিগুড়ি ভুটান ও সিকিমের দ্বারপথ। শিলিগুড়ি হইতে এই সকল রাজ্যে মোটরপথে যাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, শিলিগুড়ি—কলিকাতা, শিলিগুড়ি—গৌহাটি, শিলিগুড়ি—বালুরঘাট প্রভৃতি পথেও যানবাহন চলাচল করিতেছে। দুর্গাপুরে রাজ্য পরিবহন পর্যদের অধীনে কয়েকটি বাস বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্যে চলিতেছে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা ট্রাম ওয়েজ কোং লিঃ-এর পরিচালনার ভার রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই রাজ্যের গ্রামের কাঁচা পথে গরু-মহিষের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলাগাড়ী, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি পরিবহনের দায়িত্ব বহন করে। কোন কোন গ্রামের রাস্তায় মোটর, ট্রাক ইত্যাদিও চলাচল করে। কিন্তু শহর ও শহরগুলির পাকা রাস্তায় মোটরগাড়ী, লরী, ট্রাক, ট্রামগাড়ী, বাস, মিনিবাস, জীপ, টেম্পো ইত্যাদি মানুষ ও মালপত্রাদি লইয়া যাতায়াত করে।

**স্থলপথ**—স্থলপথকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জাতীয়-সড়ক ( National Highways ) ও (২) রাজ্য-সড়ক ( State Highways )। কলিকাতা হইতে দিল্লী, বোম্বাই, নাগপুর ও মাদ্রাজের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে বিভিন্ন জাতীয়-সড়ক। এই পথগুলি বড় বড় নগর, বন্দর, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির মধ্যদিয়া নির্মিত হইয়াছে।



পশ্চিমবঙ্গের
যাতায়াত ব্যবস্থা
জাতীয় সড়ক
রাজ্য সড়ক
জেলা সড়ক
০ ১০০
কি.মি.
সিকিম
গ্যাংটক
ভুটান
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
৩১
জলপাইগুড়ি
হলদিবাড়ী
কোচবিহার
রায়গঞ্জ
৩৪
হিলি
মালদহ
বালুরঘাট
ইংরেজবাজার
ফরাক্কা
বিহার
বাংলাদেশ
বহরমপুর
২৪°
আসানসোল
সিউড়ী
দুর্গাপুর
কৃষ্ণনগর
পুরুলিয়া
২
বর্দ্ধমান
রানাঘাট
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
বনগ্রাম
৩৫
বারাসাত
কলিকাতা
মেদিনীপুর
৬
খড়্গপুর
ডায়মণ্ড হারবার
২২°
কাকদ্বীপ
৫
কাঁথি
উড়িষ্যা
দীঘা
৮৬°
বঙ্গোপসাগর
৯০°

ইহারাই দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংযোজক পথ। এই রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। এইগুলি রাজ্য-সড়ক। এইগুলি হইতে আবার বহু শাখা-পথ ( Feeder Roads ) গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই রাজ্যে গ্রামের সংখ্যা ৩৮,০৭৪। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করিবার একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে প্রত্যেক জেলার সদর, মহকুমা সদর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য নূতন নূতন রাস্তা তৈয়ারি করা হইতেছে।

জাতীয়-সড়কের সংখ্যা ৫০টি; ইহার মধ্যে কলিকাতা-দিল্লী সড়কের [ নং ২ ] মাত্র ২৪৩ কি-মি- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিস্তৃত। ঐতিহাসিক রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। কলিকাতা হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত একটি সড়ক [ নং ৫ ] গিয়াছে। কলিকাতা হইতে খড়্গপুর হইয়া নাগপুর এবং তথা হইতে বোম্বাই বন্দর পর্যন্ত অপর একটি সড়ক [ নং ৬ ] বিস্তৃত রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে ফরাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়া মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর হইয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি সড়ক [ নং ৩৪ ] বিস্তৃত হইয়াছে। শিলিগুড়ি হইতে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার মধ্য দিয়া আসামে একটি রাস্তা গিয়াছে; ইহার দ্বারা বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসাম সংযুক্ত হইয়াছে [ নং ৩১ ]। শিলিগুড়ি হইতে সিকিম রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত একটি জাতীয়-সড়ক [ নং ৩১ক ] আছে। পুরুলিয়া জেলার মধ্য দিয়া একটি সড়ক [ নং ৩২ ] উত্তরে ধানবাদ এবং দক্ষিণে জামসেদপুর শহর দুইটিকে সংযুক্ত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ২৪ পরগনা জেলার উপর দিয়া একটি জাতীয়-সড়ক [ নং ৩৫ ] বনগাঁ

(বাংলাদেশের সীমা) পর্যন্ত গিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের নং ৬ সড়কের নিকট হইতে একটি সড়ক [ নং ৪১ ] হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে জাতীয়-সড়কগুলির ১,৫৮২ কি-মি. পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যে বিস্তৃত। চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয়-সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে।

এই সকল জাতীয়-সড়ক ব্যতীত রাজ্য সরকার নির্মিত সড়কও আছে। যেমন—উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-হলদিবাড়ী রাজ্য-সড়ক। ইহা দার্জিলিং হইতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি হইয়া হলদিবাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে। বীরভূম হইতে মেদিনীপুর, সিউড়ী হইতে বহরমপুর, কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার, চুঁচুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাজ্য-সড়ক নির্মিত হইয়াছে। চতুর্থ যোজনায় দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ ও আসানসোল প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের সহিত কলিকাতাকে যুক্ত করিবার জন্য **কলিকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে** নির্মাণের কার্য শুরু হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য আরও কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পও গৃহীত হইয়াছে। যেমন—কলিকাতা-দমদম সুপার হাই-ওয়ে, কলিকাতা-কল্যাণী-ত্রিবেণী রোড, কলিকাতা-খড়্গপুর রোড প্রভৃতি। বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তির ফলে বাংলাদেশের মধ্যদিয়া আগরতলা ও আসামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য-সড়ক বিস্তৃত হইয়াছে ২,৩৩৩·৯ কি-মি.। জেলা পরিষদ রাস্তাসমূহের বিস্তার এবং গ্রাম্য-পথের বিস্তার মোট ১১,৩৩৯·৩ কি-মি.।

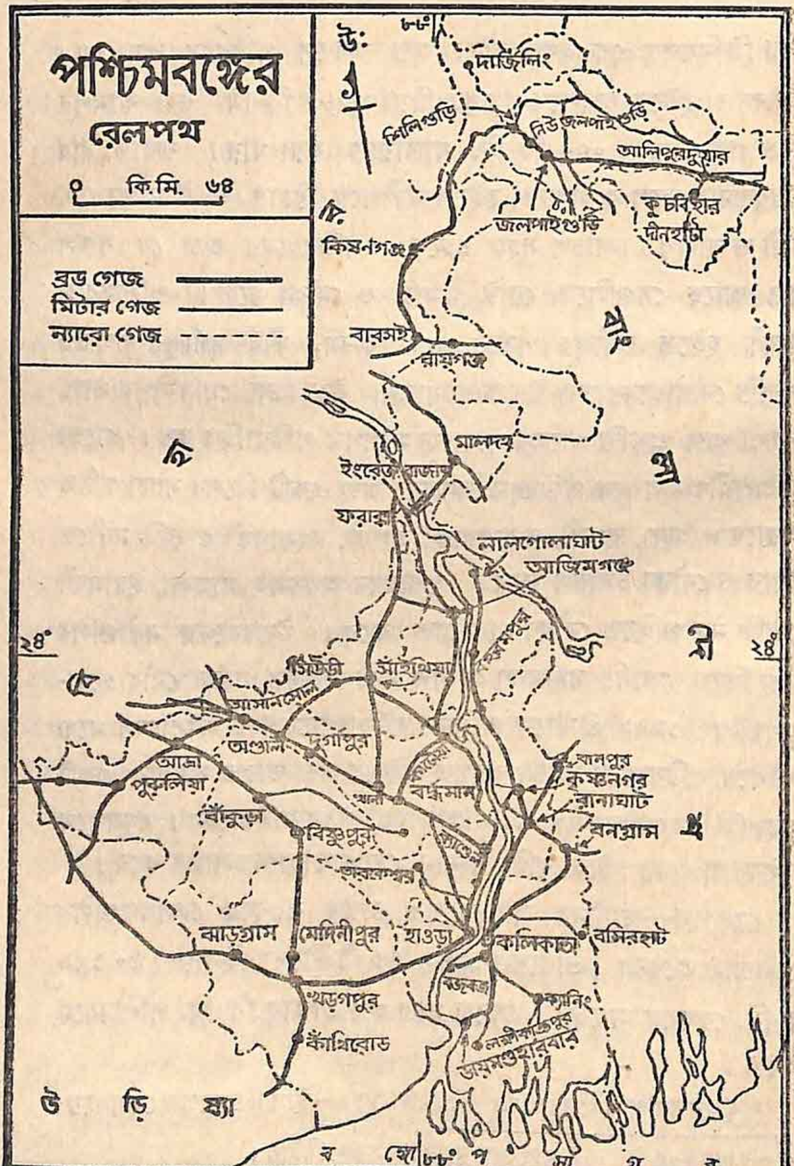
**জলপথ**—নদীপথ, খালপথ ও সমুদ্রপথ এই রাজ্যের জলপথ। পশ্চিমবঙ্গে অনেক নাব্য নদী ও খাল আছে। এই রাজ্যে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৩,১৭০ কিলোমিটার। নৌকা, স্টীমার ও লঞ্চের

দ্বারা জিনিসপত্র এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে পরিবহন করা হয়। কলিকাতা হইতে জলপথে ব্রহ্মপুত্র দিয়া ১,২৮০ কি-মি. এবং কানপুর পর্যন্ত গঙ্গা দিয়া ১,০৪০ কি-মি. যাতায়াত করা যায়। ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার ফলে কলিকাতা হইতে নদীপথে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যাত্রী ও মালপত্র চলাচল সহজ হইবে। পরিবহনের জন্য যে সকল খাল আছে সেগুলিতে ছোট স্টীমার ও নৌকা চলে। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণী হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত ১৩৭ কি-মি. দীর্ঘ দুর্গাপুর খালটিও সম্প্রতি নৌবাহনের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, মেদিনীপুর খাল, হিজলী খাল প্রভৃতি খালের সাহায্যে মালপত্র পরিবাহিত হয়। রাজ্যে আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। গঙ্গা, হুগলী, রূপনারায়ণ, হলদী, কংসাবতী প্রভৃতি নদীতে স্টীমার ও নৌকা চলাচল করে। সুন্দরবন অঞ্চলের মাতলা, ইছামতী প্রভৃতি নদীগুলিতে নৌকা যাতায়াত করে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী কিছুদূর পর্যন্ত নৌবাহনোপযোগী। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও আসামের মধ্যে নদীপথে পরিবহনের সমস্যা অবগত হইবার জন্য ভারত সরকার একটি সংস্থা (River Service Committee) গঠন করিয়াছেন। সমুদ্রপথে কলিকাতা বন্দর হইতে পৃথিবীর নানা দেশে জাহাজ চলাচল করে।

**রেলপথ**—স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার রেলপথগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। ভারতে (১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দের হিসাবে) ৬০,১৪৯ কি-মি. রেলপথ আছে। তন্মধ্যে মাত্র ৩·৫ হাজার কি-মি. পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত।

**পূর্ব-রেলপথ** (Eastern Railways)—ইহা *ব্রডগেজ রেলওয়ে।

| | | |
|---|---|---|
| *ব্রডগেজ-এ | দুই লাইনের ব্যবধান | ১·৬৮ মিটার। |
| মিটার গেজ-এ | ,, ,, ,, | ১ মিটার। |
| ন্যারো গেজ-এ | ,, ,, ,, | ·৭৭ মিটার। |


পশ্চিমবঙ্গের
রেলপথ
০ কি.মি. ৬৪
ব্রড গেজ
মিটার গেজ
ন্যারো গেজ
উঃ
৮৮°
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি
নিউজলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
দীনহাটা
কিষনগঞ্জ
বারসই
রায়গঞ্জ
মালদহ
ইংরেজবাজার
ফরাক্কা
লালগোলাঘাট
আজিমগঞ্জ
২৪°
সিউড়ী
সাঁইথিয়া
আসানসোল
অণ্ডাল
দুর্গাপুর
আদ্রা
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
বর্দ্ধমান
কৃষ্ণনগর
রানাঘাট
বনগ্রাম
তারকেশ্বর
ঝাড়গ্রাম
মেদিনীপুর
হাওড়া
কলিকাতা
বসিরহাট
খড়গপুর
ক্যানিং
কাঁথিরোড
লক্ষ্মীকান্তপুর
ডায়মণ্ডহারবার

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, শিয়ালদহ ও আসানসোল বিভাগ ইহার অন্তর্গত। এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। রেলপথটি কয়লাখনি ও শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্য দিয়া বিস্তৃত। এই রেলপথ দ্বারা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর কলিকাতা এবং আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বার্নপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি পূর্ব ভারতের শিল্পাঞ্চল সংযুক্ত। ইহার মাধ্যমে কয়লা, আকরিক লৌহ, লৌহজাত দ্রব্যাদি, ধান, চাউল, পাট, সার, চা, চিনি প্রভৃতি পরিবাহিত হয়।

এই রেলপথের এক অংশ শিয়ালদহ হইতে উত্তরে রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর হইয়া লালগোলা পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বনগাঁ, বানপুর, বারাসত, বসিরহাট পর্যন্ত একটি শাখা গিয়াছে। এই রেলপথের আর এক অংশ শিয়ালদহ হইতে দক্ষিণে বারুইপুর হইয়া ডায়মণ্ড হারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর এবং একটি শাখা সোনারপুর হইয়া ক্যানিং পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য একটি শাখা শিয়ালদহ হইতে বজবজ পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের রেলপথের অনেকাংশ বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে। ফলে রেলপথে লোকজনের যাতায়াত ও মালপত্র চলাচল সহজ হইয়াছে।

**দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railways)—এই ব্রডগেজ রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতা। ইহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বিস্তৃত। হাওড়া হইতে খড়্গপুর হইয়া ইহার একটি শাখা উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বিশাখাপত্তনম্ বন্দরে গিয়াছে; খড়্গপুর হইতে অন্য একটি শাখা পশ্চিমে নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই রেলপথের আর একটি শাখা মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, আদ্রা হইয়া গোমো পর্যন্ত গিয়াছে। আদ্রা হইতে একটি রেলপথ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে বিস্তৃত আছে। আদ্রা হইতে অপর একটি শাখা পুরুলিয়ার দিকে গিয়াছে। সম্প্রতি

এই রেলপথে পাঁশকুড়া হইতে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত একটি শাখা-রেলপথ নির্মিত হইয়াছে।

**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** ( North-East Frontier Railways )—এই রেলপথের অধিকাংশই মিটার-গেজ। এই রেলপথ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে বিস্তৃত। ইহা বিহারের কাটিহার হইতে ডালখোলা হইয়া শিলিগুড়ি, জলপাই-গুড়ি এবং সেখান হইতে মাদারিহাট, রাজাভাত-খাওয়া, আলিপুরদুয়ার হইয়া আসামের গৌহাটি পর্যন্ত গিয়াছে। আলিপুরদুয়ার হইতে কুচবিহার ও দিনহাটা পর্যন্ত একটি শাখা বিস্তৃত হইয়াছে। এই রেলপথে প্রধানত চা, কাষ্ঠ, কেরোসিন তৈল, ধান, গম, পাট, চিনি, তামাক ইত্যাদি পরিবাহিত হয়।

ফরাক্কা সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে একটি ব্রডগেজ লাইন ঐ সেতুর উপর দিয়া মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর হইয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া, হাওড়া—আমতা ব্রডগ্রেজ রেলপথের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রডগেজ রেলপথ ব্যতীত ৩১৪ কি-মি. দীর্ঘ কয়েকটি ন্যারোগেজ লাইনও আছে। যথা—শান্তিপুর - কৃষ্ণনগর - নবদ্বীপঘাট, বাঁকুড়া-সোনামুখী-রায়নগর, বর্ধমান-কাটোয়া, আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথ ইত্যাদি। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথটি লাইট গেজের ( মাত্র ২ ফুট চওড়া )।

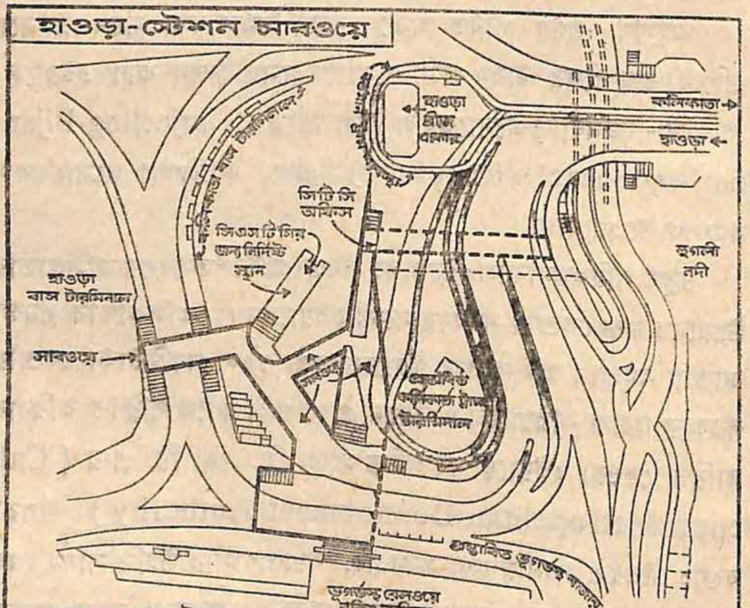
**বিমানপথ**—খুব অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহনে বিমানপথ অপরিহার্য। ইহার উন্নতির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বিমানপথ জাতীয়করণ করিয়াছেন। তখন হইতে ভারতের নিজস্ব বিমানপোতগুলি "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন"-এর ( I.A.C. ) কর্তৃত্বাধীনে দেশের প্রধান নগর ও বিমান

বন্দরসমূহের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিমান-বন্দর দমদম কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত। ইহা একটি আন্তর্জাতিক বিমান স্টেশন। এই বিমান-বন্দর হইয়া পৃথিবীর নানা দেশের বড় বড় বিমান যাতায়াত করে। এই বিমান-বন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর নানাদেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, এই রাজ্যে আরও কয়েকটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র আছে। যথা—শিলিগুড়ির নিকট বাগডোগরা, আমবাড়ি (জলপাইগুড়ি), পানাগড় (আসানসোল), ব্যারাকপুর, কলাইকুণ্ডা (খড়্গপুর) প্রভৃতি। বিমান চালনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেহালায় রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি ফ্লাইং ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট আছে।

**রজ্জুপথ**—দুর্গম পার্বত অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া রজ্জুপথের দ্বারা যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দার্জিলিং-বিজনবাড়ি-মনোকেব্‌ল রোপওয়ে (Darjeeling-Bijanbari-monocable Ropeway) এবং কালিম্পং মনোকেব্‌ল্ রজ্জুপথ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পরিকল্পনাকাল হইতে বহু সমস্যা প্রপীড়িত বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করিয়াছেন। উন্নয়ন প্রকল্পগুলি কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে নব গঠিত সংস্থা সি. এম. ডি. এ-র (Calcutta Metropolitan Development Authority) উপর। বস্তীর উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন, জল নিষ্কাশন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, জঞ্জাল অপসারণ, নূতন এলাকা গঠন, সমাজ কল্যাণ, পথ নির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদি নানাবিধ প্রকল্পের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হইয়াছে। টালিগঞ্জে ২৫টি গভীর নলকূপ ও ১৩টি জলাধার তৈয়ারি করিয়া পানীয় জল সরবরাহের নূতন পাইপ লাইন বসানো হইতেছে। জল নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কলিকাতা শহরের ট্রাফিক জ্যাম দূরীকরণের জন্য ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের রূপায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতার রাস্তাঘাট চওড়া ও মেরামত করিবার কাজ দ্রুত চলিতেছে। এক্ষেত্রে বি. টি. রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, ডায়মণ্ড হারবার রোড প্রভৃতির উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাবোর্ণরোডে লোক চলাচলের সুবিধা ও পথ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য উড়াল সেতু ( fly over bridge ) নির্মাণের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।




হাওড়া স্টেশনের নিকট জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাব-ওয়ে নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতায় বাসস্থানের অভাব



কলিকাতার নির্মীয়মাণ
ভূগর্ভস্থ রেলপথ
স্কেল
০ ১ ২
কি.মি.
নতুন
বাকল্যাণ্ড
ব্রীজ
হাওড়া ব্রীজ
হাওড়া স্টেশন
বেলগাছিয়া
গিরিশ পার্ক
সেন্ট্রাল
চাঁদনীচক
এসপ্ল্যানেড
পার্ক স্ট্রীট
ময়দান
রবীন্দ্র সদন
ভবানীপুর
হাজরা রোড
যতীনদাস পার্ক
কালীঘাট
রাসবিহারী এভি:
রবীন্দ্র সরোবর
প্রিন্স আনোয়ারশা রোড
টালীগঞ্জ
টালি নালা
বেলেঘাটা খাল

দূরীকরণের নিমিত্ত নূতন গৃহ নির্মাণ এবং লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকল্পে লবণহ্রদ ভরাট করিয়া এই অঞ্চলে উপনগরী তৈয়ারি করা হইবে। কতকগুলি সরকারী অফিস ভবন তথায় নির্মিত হইতেছে। ছোট বড় কয়েকটি সেতু নির্মাণের প্রকল্পও এই সংস্থা গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় হুগলী সেতু এবং ইহার দুই পার্শ্ব দিয়া লোক চলাচল ও পরিবহন উন্নতির জন্য এক মেট্রোপোলিটন হাই-ওয়ে প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারত সরকার ৫২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টার প্রভৃতির উন্নয়ন এই ব্যবস্থার কর্মসূচী। অনুন্নত অঞ্চলেও ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দের তথ্যে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী ডাকঘরের সংখ্যা ৫,০০৩ ; তন্মধ্যে যুক্ত ডাক ও তার অফিসের সংখ্যা ৫১৪। ভারতে টেলি-কমিউনিকেশনের কার্যাবলীকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থা ও দূরগামী টেলিফোন ব্যবস্থা। বৈদেশিক বা সাগর পারের সঙ্গে যোগাযোগ ( The Overseas Communication ) স্থাপনের নিমিত্ত ভারতকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বেতার-ফটো, বেতার-টেলিফোন, বেতার-টেলিগ্রাফ, আন্তর্জাতিক টেলেক্স প্রথা ( Telex or Teleprinter Exchange System ), টেলিভিসন প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বার্তাবিনিময় সম্ভবপর হইয়াছে।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে আন্তর্মহাদেশীয় যোগাযোগের জন্য প্রথমে নয়াদিল্লীতে জাতীয় টেলেক্স সার্ভিস ( The National Telex Service ) শুরু হয়। দেশের বিখ্যাত নগরগুলির সরকারী বড় অফিস, সংবাদপত্র ও বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত টেলিপ্রিণ্টারের

মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান-প্রদান (Teleprinter Exchanges) চলিতেছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজের হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার্স লিঃ রোমান ও দেবনাগরী অক্ষরে ৬,৫৭৮ টেলিপ্রিণ্টার ইউনিট তৈয়ারি করে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে দেশের ৪৯টী বড় শহরের মধ্যে ১২,৪৪০ টেলেক্স সার্ভিস (যোগাযোগ) স্থাপিত হইয়াছে। বৈদেশিক যোগাযোগ সংরক্ষণের জন্য ভারতে কতকগুলি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা তন্মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল শহরে একটি টেলেক্স এক্স্চেঞ্জ স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বেতার পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধন ব্যবস্থায় (Wireless Planning and Co-ordination) ভারতের সর্বত্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়াছে। কলিকাতা ভারতের অন্যতম বেতার উপদেশক কেন্দ্র (Monitoring Station)। কলিকাতা, শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াং শহরে বেতার কেন্দ্র আছে। বেতার, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনশিক্ষার মাধ্যম। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট কলিকাতা শহরে একটি টেলিভিসন (Television) কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে কলিকাতা সারা ভারত তথা বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রাখিতে সক্ষম হইবে। ইহা ভিন্ন, টেলিভিসন এই রাজ্যের শিক্ষাপ্রসার ও জনসংযোগ সাধনের সহায়ক হইবে। দিল্লী টি. ভি. কেন্দ্র হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বিকাশের জন্য মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সাহায্যে ইংরাজী এবং অঙ্ক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। রেডিও, টেলিভিসন, রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ড প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্‌স্ শিল্পজাত দ্রব্য।

ভারত সরকার পঞ্চম পরিকল্পনায় আণবিক, মহাকাশ ও ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্‌ শিল্পের অধিকতর উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন।

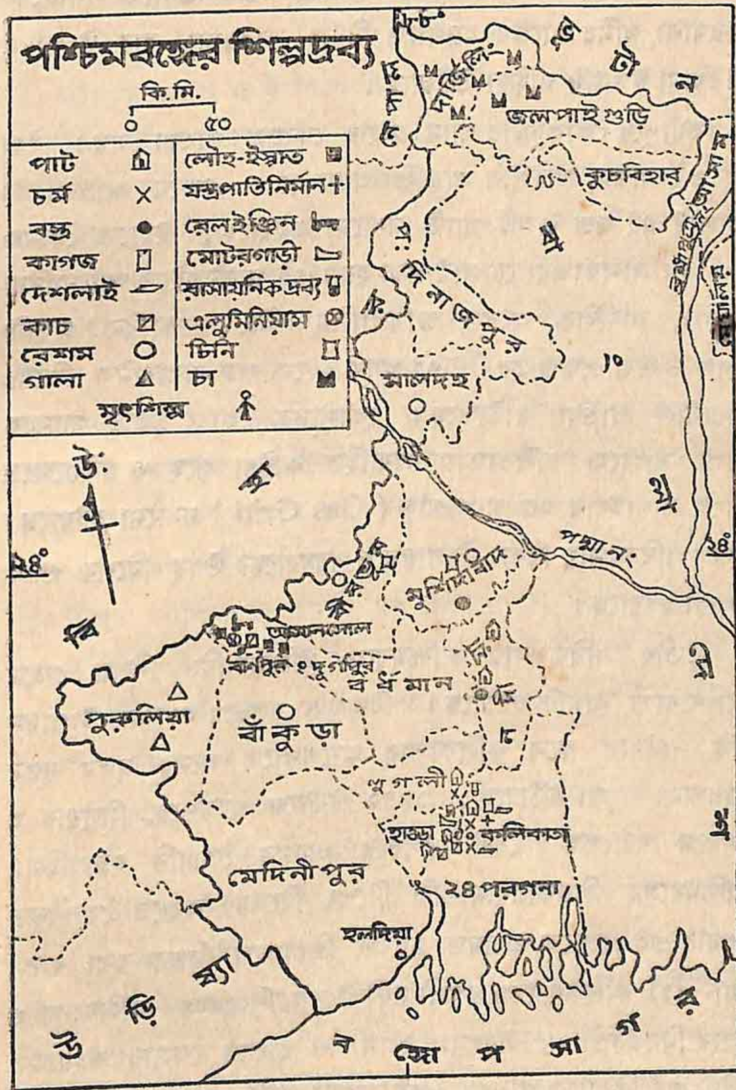
## চতুর্থ পাঠ

### শিল্প*

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শিল্পপ্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের শিল্পায়ণে সহায়তা করিয়াছে দুইটি কারণ—কলিকাতা বন্দর ও কয়লা। কলিকাতা পূর্বভারতের বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র, বিদেশের সহিত সমুদ্র পথে যোগাযোগের দ্বারস্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ১৯৩·৭ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। কয়লার সহায়তায় কলিকাতার আশেপাশে এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ময়ূরাক্ষী, জলঢাকা প্রকল্পের দ্বারা জলবিদ্যুৎ এবং সান্তালদি, দুর্গাপুর ও ব্যাণ্ডেল কেন্দ্র হইতে তাপবিদ্যুৎ শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লা ভিত্তিক এক বিরাট শিল্পযজ্ঞ চলিতেছে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে। এখানে কোক চুল্লী ও উপজাত পদার্থের উৎপাদন কারখানা, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা, লৌহ ও ইস্পাত এবং সঙ্কর ইস্পাত উৎপাদন কারখানা, লেন্স তৈয়ারির কারখানা, প্রেসার-

---

* শিল্প সম্বন্ধে পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে শিল্পগুলি কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে কেবল তাহাই আলোচনা করা হইল।


পশ্চিমবঙ্গের শিল্পদ্রব্য
কি.মি.
০
৫০
পাট
চর্ম
বস্ত্র
কাগজ
দেশলাই
কাচ
রেশম
গালা
লৌহ-ইস্পাত
যন্ত্রপাতিনির্মাণ
রেলইঞ্জিন
মোটরগাড়ী
রাসায়নিকদ্রব্য
এলুমিনিয়াম
চিনি
চা
মৃৎশিল্প
উ:
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
আসানসোল
বর্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
মেদিনীপুর
হাওড়া
কলিকাতা
২৪ পরগনা
হলদিয়া
পদ্মা নং
২৪°

ভেসেল, বয়লার ও সিমেণ্ট কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, খনির কাজের যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা, সার উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুর্গাপুরে কোকচুল্লীর গ্যাস হইতে বেনজল পাওয়া যায়। ইহা হইতে বেনজিন, জাইলীন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখানে আলকাতরা চোলাই-এর জন্য একটি প্ল্যাণ্ট বসানো হইয়াছে। ইহাতে দৈনিক ১০০ টন আলকাতরা চোলাই করা হয়। এই প্ল্যাণ্ট হইতে অ্যামোনিয়া লিকার, কার্বলিক অয়েল, ন্যাপথালিন, পীচ, স্যাকারিন প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই প্ল্যাণ্ট হইতে গুরু রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যাইতেছে। দুর্গাপুরের কোক চুল্লীর গ্যাসকে নলের সাহায্যে কলিকাতায় প্রবাহিত করিয়া গৃহে ও শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার জন্য গ্যাসগ্রীড ( Gas Grid ) বসানো হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রগতি হইয়াছে। বিদ্যুৎ ও রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার ফলে কলিকাতার আশেপাশে অনেক নূতন নূতন কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে খড়্গপুরে, লিলুয়ায় ও দমদমে সর্বাপেক্ষা বেশী রেলওয়ে ওয়াগন তৈয়ারি হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানাগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এই রাজ্যকে প্রধানত চারিটি শিল্পাঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **কলিকাতা বা হুগলী নদীতীরের শিল্পাঞ্চল**—কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী ২৪ পরগনা, হুগলী ও হাওড়া জেলার শহরাঞ্চল লইয়া এই শিল্পাঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে পাটশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কার্পাস বয়নশিল্প ও কাগজ শিল্প উল্লেখযোগ্য। (২) **আসানসোল-**

**রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল**—এই অঞ্চলে বার্নপুরের ( IISCO ) লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প প্রসিদ্ধ। (৩) **দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্য ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। বর্তমানে দুর্গাপুরে বছরে ১৬ লক্ষ টন ইস্পাত-পিণ্ড প্রস্তুত হয়। বার্ণপুর কারখানায় বছরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত-পিণ্ড তৈয়ারি হয়। চিত্তরঞ্জনে বছরে ৩০০টি রেল ইঞ্জিন তৈয়ারি হয়; ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে এখানে ৬৫টি বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন তৈয়ারি হইয়াছে। এখানে বয়লার ও ডিজেল শান্টিং ইঞ্জিনও ( Shunting locomotives ) তৈয়ারি হয়। (৪) **দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের শিল্পাঞ্চল**—দার্জিলিং জেলায় ১৩০টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫৫টি চা বাগান এবং তৎসংলগ্ন ২৭০টি চা-এর কারখানা আছে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৪৬·৭৩ কোটি কে-জি. চা উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে চা উৎপন্ন হইয়াছিল ১০·৮৫ কোটি কে-জি.। দার্জিলিং-এর চা পৃথিবী বিখ্যাত। পাট ও চা শিল্প হইতে এই রাজ্য সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ আছে। শিল্পের জন্য যেমন কৃষি কাঁচামালের যোগানদার, তেমনি শিল্প কৃষিকে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্র ও বৈদ্যুতিক পাম্প ইত্যাদি যোগান দেয়। সুতরাং **কৃষি ও শিল্প** পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের উন্নতি না হইলে কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। চট, চিনি, বস্ত্র ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্পে কাঁচামালের অভাবে মন্দার ভাব দেখা দেয়। রাজ্য সরকার শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন বাড়াইয়া শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে দূরবর্তী জেলা ও গ্রামসমূহের কোন আর্থিক লাভ হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সরকারের লক্ষ্য হইল প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া এই রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করিয়া শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলা। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পায়ত করাই সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উত্তরপাড়ায় হিন্দ্ মোটরস্ নামে মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা। এখানে প্রতিবৎসর ১২,০০০ গাড়ী তৈয়ারি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর দুই তীরে **পাট শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যের ১০১টি **পাটের কলের** মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ১৯৬৭-'৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে অনেকগুলি কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ৬৬টি পাটের কলে কাজ চলিতেছে। এখানে উৎকৃষ্ট মানের কাঁচাপাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করিয়া উন্নত ধরনের পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে কাঁচা পাট ও মেস্তার উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৮০ লক্ষ বেল ও ২০ লক্ষ বেল ( ১ বেল=১৮০ কে-জি. )। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ ১০ হাজার টন চট, থলে, ত্রিপল, কার্পেট ইত্যাদি পাটজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই রাজ্যে ৪১টি কাপড়ের কল আছে। কার্পাস বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া গেঞ্জি, মোজা, তোয়ালে ইত্যাদি হোসিয়ারী শিল্পও উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ কে-জি. সুতা, ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ মিটার মিলের কাপড় এবং প্রায় ১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ মিটার তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই রাজ্যের রাসায়নিক শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। হেভি কেমিক্যালস্, ঔষধপত্র, কাঁচ, মৃৎশিল্প, কাগজ ইত্যাদিতে এই শিল্পের অবদান অপরিসীম। ইক্ষু উৎপাদনের সুবিধা থাকায় বীরভূম জেলার আহমদপুরে ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিঃ নামে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৭২-'৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই কলে ১৭ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় ও নদীয়া জেলার পলাশীতে চিনির কল আছে। কিন্তু এই রাজ্যের কলগুলিতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। কারণ, ভারতে ইক্ষু চাষের জমির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে ইক্ষুর ফলন *একর প্রতি গড়ে ২০ হইতে ২৩ টন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩,৭১২ টন। পঞ্চম যোজনায় মুর্শিদাবাদের লালবাগে, কালিয়াচকে এবং মালদহের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে চিনির কল স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজ্যের কাগজশিল্প, রবার শিল্প, বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাগজের কলগুলি নৈহাটি, কাকিনাড়া, টিটাগড়, আলমবাজার, বালী, শ্রীরামপুর, ত্রিবেণী ও রাণীগঞ্জে অবস্থিত। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ১৩ কোটি ১৩ লক্ষ কে-জি. কাগজ ও বোর্ড তৈয়ারি হইয়াছে। হুগলী জেলার সাহাগঞ্জে রবারের টায়ার, টিউব ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। হাওড়া জেলায় বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে প্রায় ৬০০টি ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা—হাওড়া অঞ্চলে বৈদ্যুতিক পাখা, হিমায়ণযন্ত্র, বেতারযন্ত্র, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি প্রচুর প্রস্তুত হয়।

---

* ১ একর = ·৪০ হেক্টেয়ার

ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ **এ্যালুমিনিয়ম** তৈয়ারির কারখানা আসানসোলের নিকটে জে. কে. নগরে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন, বেলুড়েও একটি এ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে। আসানসোলের নিকটে রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার তৈয়ারির জন্য **হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌** ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে **হলদিয়ায়** একটি **সার** কারখানা, **তৈল শোধনাগার** ও একটি **পেট্রোকেমিক্যাল** ( খনিজ-তৈলজাত রাসায়নিক ) শিল্প কারখানা এবং শিলিগুড়িতে একটি কাগজ ও কাগজের বোর্ডের শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। পুরুলিয়া জেলাতেও সান্তালদি-রামকেনালী এলাকার আকরিক সম্পদ ও বিদ্যুতের সাহায্যে শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এই জেলার রঘুনাথপুরে একটি **সিমেণ্টের** কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে **কুটীর শিল্পের** সমৃদ্ধির জন্য মাত্র ১·১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের ৪ লক্ষাধিক লোক কুটীর শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদিগের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে কুটীর শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় কুটীর শিল্প **তাঁতশিল্প**। ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, বেগমপুর, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাঁত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য **কল্যাণীতে** সরকারী পরিচালনায় ৫০,০০০টি মাকু সমন্বিত মিহি সুতার কল স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ফলে কুটীর শিল্পের অগ্রগতি হইয়াছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যে তাঁতের সংখ্যা হইল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। বর্তমানে এই রাজ্যে

১,৬০০টি বিদ্যুৎচালিত তাঁত আছে। হস্তচালিত ও রেজেস্ট্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংখ্যা ৮৭,৮০০। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের কাজে অনেক নারী শ্রমিকও নিযুক্ত আছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে হস্ত-চালিত তাঁত ও বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত শিল্পগুলিতে প্রায় ৩৪ কোটি ১৩ লক্ষ মিটার বস্ত্র এবং ৩ কোটি ৮২ লক্ষ কে-জি. সুতা তৈয়ারি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গকে ৬,০০০টি নূতন তাঁত বসাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ( চতুর্থ পরিকল্পনায় ) এখানে ২ হাজার বেল তূলা উৎপাদিত হয়। মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁত-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ধুতি ( বর্ডার দেওয়া ), বিছানার চাদর, তোয়ালে, রঙিন শাড়ি, লুঙ্গি, কাপড় প্রভৃতি তাঁতে উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

কৃষিভিত্তিক রেশমশিল্পের কাজে বিভিন্নভাবে কর্মী নিয়োগের সুযোগ সুবিধা আছে। দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি স্থানে উন্নত জাতের বিদেশী রেশমকীট পালন করিয়া মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার রেশম চাষীদের রেশম কীটের ডিম যোগান দেওয়া হয়।

রেশমশিল্প শিক্ষাদানের জন্য বহরমপুরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। গুটিপোকা পালন, উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন, সুতা পাকাইবার উন্নত পন্থা প্রভৃতি সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেশমের উৎপাদন ২·৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মালবেরি ও অমালবেরি রেশম ( এরি ও তসর ) উৎপাদন হয়। তুঁতের চাষ ৪·৮ হাজার হেক্টেয়ার হইতে ৬·৪ হাজার হেক্টেয়ারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও

বীরভূমে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার কয়েকটি পর্ষদ গঠন করিয়াছেন।

চর্মশিল্পের দুইটি বিভাগ—(ক) কাঁচা চামড়া হইতে পাকা চামড়া তৈয়ারি অর্থাৎ ট্যানিং করা এবং (খ) পাকা চামড়ার সাহায্যে জুতা, স্যুটকেশ, ব্যাগ ও নানারকম সৌখিন দ্রব্য তৈয়ারি করা। বাটানগরে জুতা নির্মাণের বিরাট কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গের নারিকেল ছোবড়ার শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৮ লক্ষ লোক এই কার্যে নিযুক্ত আছে। হাওড়া ( ধূলাগিরি ও লতিবপুর ), ২৪ পরগনা ( জোকা ) ও মেদিনীপুর জেলায় ( বালিসাই ) ছোবড়া শিল্পের শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রীয় নারিকেল ছোবড়া পর্ষদের উদ্যোগে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে 'আদর্শ নারিকেল ছোবড়া কারখানা' সহ একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কল্যাণী, ঝাড়গ্রাম, দুর্গাপুর ও কুচবিহারে কারিগরী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য পুরুলিয়ার আদিবাসী ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ-লাক্ষা বিতরণ করা হয়। পুরুলিয়ায় ৫টি লাক্ষাকীট উৎপাদন খামার ও ১টি লাক্ষা গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। ঝালদা ও বলরামপুরে লাক্ষা শিল্পের কারখানা আছে। বাঁকুড়া জেলায় আরও তিনটি খামার আছে। এখানে লাক্ষার জিনিস ও বার্ণিশ তৈয়ারির একটি শিল্পকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই রাজ্যের হস্তশিল্পের ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে হস্তশিল্পের বিশেষ প্রসার হইয়াছে। ১৯৬১ হইতে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬,৮১০। হস্তশিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে

বিক্রয় কেন্দ্র ( Emporium ) খোলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, শিল্পীদিগের প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। শোলা ও শাঁখের জিনিস, কাঠ ও মাটির তৈয়ারি খেলনা, মাটির প্রতিমা, ডাকের সাজ, কাগজের মণ্ডের মুখোস, বেত ও বাঁশের কাজ, কাঁসা-পিতলের বাসন, সূচীর কাজ, চীনামাটি ও পোড়া মাটির কাজ, সোনা-রূপার গহনা, হাতীর দাঁতের কাজ, মহিষের শিং ও হাড়ের জিনিস, ছুরি, কাঁচি, কোদাল প্রভৃতি বহু বিচিত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হস্তশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সকল গ্রামীণ শিল্পে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই নিযুক্ত আছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির উন্নতি সাধনের জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে।

কলিকাতার শহরতলি টালিগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মানের স্টুডিও গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে সম্প্রতি টেলিভিসন কেন্দ্র ( স্টুডিও ) স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকার ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ শিল্পের উন্নতির জন্য একটি করপোরেশন গঠন করিয়াছেন। ইলেকট্রনিকস্, পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিচায়ক। পর্যটন-শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষে সহায়ক। প্রতি বৎসর যাহাতে বহুসংখ্যক পর্যটক এই রাজ্যে আসেন তাহার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট। আরামদায়ক বাসস্থান, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের উৎসাহ ও আনন্দ দান করে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ( Wild Life Sanctuary ), শান্তিনিকেতন, দীঘা প্রভৃতি এই রাজ্যের আকর্ষণীয় স্থান। চতুর্থ পরিকল্পনায় ( ১৯৬৯-'৭৪ ) পর্যটন কেন্দ্র-গুলির উন্নয়নের জন্য ৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ও কলিকাতার বেলগাছিয়ায় একটি

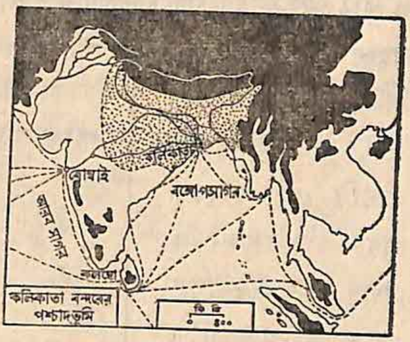
সরকারী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। হরিণঘাটা, টালিগঞ্জ, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়িতে পোলট্রি ফার্ম ( Poultry Farm ) বা হাঁস-মুরগী পালনকেন্দ্র এবং বেলগাছিয়ায় একটি পশুপালন কেন্দ্র আছে।

## পঞ্চম পাঠ

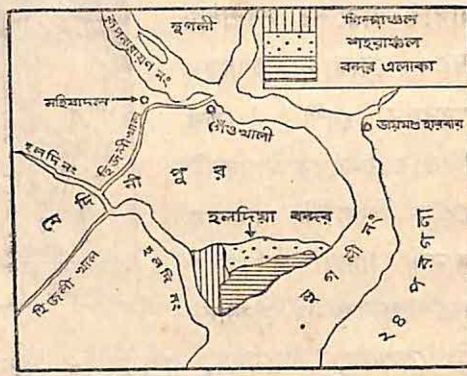
# বাণিজ্য

বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোন দেশ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সকল দেশে সকল রকম দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়। প্রত্যেক দেশই উহার উৎপন্ন দ্রব্যের কতকগুলি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এবং বিভিন্ন দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য আমদানি করে। আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে বর্তমানে ভারত প্রধানত জলপথে পৃথিবীর নানাদেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। বিমানপথেও কিছু মালপত্র আমদানি রপ্তানি করা হয়। এইরূপ বাণিজ্যের নাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)। মূলত বহির্বাণিজ্যের ( External Trade ) প্রকৃতির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ( Internal Trade ) প্রকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সকল রাজ্যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের সমান দক্ষতা বা সুযোগ-সুবিধা থাকে না। যেমন, বোম্বাই-এর ন্যায় বস্ত্র শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের নাই, আবার পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পাট শিল্পের সুযোগ-সুবিধা বোম্বাই-এর নাই। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু অন্য রাজ্যে রপ্তানি করিয়া ভিন্ন রাজ্য হইতে বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করে।

প্রত্যেক দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য উহার বিভিন্ন সম্পদ ( বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ ) এবং বন্দরের উন্নতির উপর নির্ভর করে। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। বোম্বাই ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর। বোম্বাই বন্দরের আমদানি বেশী; কিন্তু কলিকাতা বন্দরের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ব্যবসায় প্রধান। সমগ্র পূর্বভারত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। পশ্চাদ্‌ভূমি রেলপথ, বিমানপথ, জলপথ ও সড়ক দ্বারা সংযুক্ত থাকিবার ফলে পণ্য দ্রব্য পরিবহনের খুব সুবিধা আছে। কলিকাতা বন্দরে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যদ্রব্য সযত্নে রাখিবার জন্য প্রচুর গুদামঘরের বন্দোবস্ত আছে। রপ্তানি হইতে ভারত সরকারের যত আয় হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ আসে পশ্চিমবঙ্গ হইতে। বাণিজ্যপণ্যের মধ্যে পাটই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বৎসরে গড়ে ৯ লক্ষ টন পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়া কাঁচা পাটের চাহিদা মিটিলেও উৎকৃষ্ট পাটের অভাব এখনও রহিয়াছে। সেই কারণে বাংলাদেশ হইতে উৎকৃষ্ট পাট আমদানি করিয়া পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল পাটজাত দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে চা রপ্তানি হয় ১২৩·৬৩ কোটি টাকা মূল্যের। দার্জিলিং-এর চা বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। প্রায় ¾ অংশ চা যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হয়। তথা হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে



পুনর্প্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের চট, চামড়া ; বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, গালা, তৈলবীজ, তামাক ; উত্তরপ্রদেশের তূলা, গম, তৈলবীজ, রবিশস্য এবং মধ্যপ্রদেশের তূলা ও কাঠ কলিকাতা বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, শৌখিন দ্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান আমদানি দ্রব্য। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় হলদি ও হুগলী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হলদিয়ায় একটি নূতন বন্দর নির্মাণের কার্য চলিতেছে। এই বন্দরের দ্বারা কলিকাতা বন্দরের উপর চাপ কিছু কম হইবে। হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া এখানে একটি শিল্প-শহর গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা আছে। এই বন্দরে একটি তৈল শোধনাগার নির্মিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে পেট্রোরসায়ন শিল্পের কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। এখানে জাহাজ নির্মাণের একটি পরিকল্পনাও রহিয়াছে।



হলদিয়া বন্দর

স্থলপথে নেপাল ও ভুটানের সহিত পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য চলে। রেলপথে ও জলপথে (নৌকা, স্টীমার ইত্যাদির সাহায্যে নদী পথে) বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলে। এতদ্ব্যতীত, রেলপথে ও জলপথে ভিন্ন রাজ্যের সহিতও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য চলে। যে কোন দেশের আর্থিক উন্নতিতে রপ্তানি বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

রাজ্যের বাণিজ্য কর্পোরেশন ( State Trading Corporation ) রপ্তানি বাণিজ্যে নানাভাবে সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেন। তথাপি, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত নানা বিষয়ে আমদানির উপর নির্ভরশীল। বিদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ শিল্পের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করা হয়।

১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৫২১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়। নিম্নে কয়েকটি রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া হইল।*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | কয়লা ও কোক | ৬,২১,৫৪,৭৯৭ | কুইন্টাল |
| ২। | ফল ( শুষ্ক ) | ১৮,৭৬০ | " |
| ৩। | কাঁচ | ৫০,৬২৩ | " |
| ৪। | পশুচর্ম ( কাঁচা ও পাকা ) | ২,৩২,৪০৫ | " |
| ৫। | পাট ও পাটজাত দ্রব্য | ৫০,৪০,০১৮ | " |
| ৬। | লৌহ ও ইস্পাতের বার, পাত ইত্যাদি | ১,৫২,২৪,৩৬২ | " |
| ৭। | তৈলবীজ | ১৬,২২,২২৪ | " |
| ৮। | চা | ৫,২০,০৯২ | " |

* Source : Statistical Hand book, Govt. of W. B.

# পরিশিষ্ট

## বিবিধ প্রশ্নাবলী

**প্রথম অধ্যায় :**

১। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান, আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ ও পার্বত দেশগুলির সহিত সম্বন্ধ পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পক্ষে কিরূপে সহায়তা করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

**দ্বিতীয় অধ্যায় :**

**প্রথম পাঠ**

১। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বিভাগ ? উহাদের নাম কর এবং উহাদের অন্তর্গত জেলাগুলির নাম কর।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) স্বাভাবিক উদ্ভিদ, (ঘ) কৃষি, (ঙ) শিল্প, (চ) অধিবাসী।

৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান ও গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর :—
জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, বক্সা, কার্সিয়াং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, বাগডোগরা।

৪। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র আঁকিয়া তন্মধ্যে নদ-নদীগুলি দেখাও।

**দ্বিতীয় পাঠ**

১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) জলসেচ, (ঘ) কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন দ্রব্য।

২। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কোন্ কোন্ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গড়িয়া উঠিবার কারণ কি কি ?

বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, আহমদপুর, ঝালদা, বিষ্ণুপুর।

**তৃতীয় পাঠ**

১। পশ্চিমবঙ্গের পলিগঠিত সমভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের নাম কর এবং কোন্ কোন্ জেলা কোন্ কোন্ ভাগের অন্তর্ভুক্ত তাহা বল।

২। সমভূমি অঞ্চলের নদ-নদীগুলির নাম কর এবং উহাদের গতিপথ বর্ণনা কর। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আঁকিয়া গঙ্গানদীর দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলি দেখাও।

৩। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করিয়া গাঙ্গেয় সমভূমির এক সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

(ক) জলবায়ু, (খ) কৃষি ও (গ) শিল্প।

৪। নিম্নলিখিত স্থানগুলির গুরুত্ব বর্ণনা কর :—

কলিকাতা, দমদম, শিবপুর, কৃষ্ণনগর, কল্যাণী, মুর্শিদাবাদ, রায়গঞ্জ, কুচবিহার।

**চতুর্থ পাঠ**

১। ব-দ্বীপ কাহাকে বলে? গঙ্গার ব-দ্বীপকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগের নাম কর এবং প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। খাড়ি ও বালিয়াড়ি কি? এইগুলি কোথায় দেখা যায়?

৩। উপকূলের নিম্নভূমির জলবায়ু বর্ণনা কর।

৪। সুন্দরবন অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর বিবরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া উপকূলের নিম্নভূমির ভৌগোলিক বিবরণ দাও :—

নারিকেল চাষ, লবণ উৎপাদন, মৎস্য শিকার, কাষ্ঠ শিল্প।

৬। কি কারণে বিখ্যাত?

হলদিয়া, দীঘা, ডায়মণ্ড হারবার, সাগরদ্বীপ।

## তৃতীয় অধ্যায় :

**প্রথম পাঠ**

১। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কাহাকে বলে? পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত নদী পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, কংসাবতী পরিকল্পনা, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা।

৩। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও। পশ্চিমবঙ্গের জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নাম কর।

## দ্বিতীয় পাঠ

১। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

## তৃতীয় পাঠ

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার কিরূপ উন্নয়ন হইয়াছে তাহা উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

## চতুর্থ পাঠ

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প, কাগজশিল্প ও নারিকেল ছোবড়ার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। পশ্চিমবঙ্গের তাঁত-শিল্প ও রেশম-শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কুটীর শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি কাজ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

৪। নিম্নলিখিত শিল্পগুলি কোন্ কোন্ স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে?
লাক্ষাশিল্প, মৃৎশিল্প, পোলট্রি ফার্ম, পশুপালনকেন্দ্র, মৎস্যশিকার, দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি নির্মাণ।

৫। পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র আঁকিয়া তন্মধ্যে পাঁচটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র দেখাও।

## পঞ্চম পাঠ

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাহাকে বলে? ইহারা কি মূলত এক? এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও।

# বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

[ নিম্নে কতকগুলি বিষয়নিষ্ঠ (objective) প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হইল। শিক্ষকগণ ইচ্ছানুযায়ী গুণের দিক্ হইতে প্রশ্নগুলির মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংযোজন করিতে পারেন। ]

## প্রথম অধ্যায়

১। অশুদ্ধ শব্দটি/শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(i) পশ্চিমবঙ্গের পূর্বে আসাম/সিকিম।

(ii) নেপালের রাজধানী থিম্ফু/কাঠমণ্ডু।

(iii) শিলিগুড়ি হইতে মোটর পথে সিকিমে/ভুটানে যাওয়া যায়।

(iv) ভুটান ও সিকিম শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত/উন্নত নহে।

(v) বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান/শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রথম পাঠ

১। এক কথায় শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে—অঞ্চল অবস্থিত।

(ii) বর্ষাকালে—নদীতে ভীষণ বন্যা হয়।

(iii) জলপাইগুড়ির পশ্চিম সীমা দিয়া—নদী প্রবাহিত হইতেছে।

(iv) জলপাইগুড়ির—কয়লা পাওয়া যায়।

(v) —জলপাইগুড়ির পার্বত অঞ্চলের সর্বপ্রধান শিল্প।

(vi) ভ্রমণকারীরা—গণ্ডার দেখিতে যায়।

(vii) —একটি বিখ্যাত রেলস্টেশন।

২। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হ্যাঁ' এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' শব্দটি লিখ :—

(i) সিংগলীলা পর্বতের শৃঙ্গ সান্দাকফু।

(ii) জলঢাকা প্রকল্পে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।

(iii) শীতকালেই দার্জিলিং-এ মনোরম আবহাওয়া থাকে।

(iv) কালিম্পং শহরের জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর।

(v) দার্জিলিং হিমালয়ের গাত্রে শাল, সেগুন প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে।

(vi) মংপুতে বড় এলাচির চাষ হয়।

(vii) চা-শিল্পে দার্জিলিং-এর স্থান প্রধান।

(viii) দার্জিলিং-এ বৃহদায়তন শিল্প নাই।

## দ্বিতীয় পাঠ

১। নিম্নের প্রতি সারিতে বিজাতীয় শব্দটির নীচে দাগ দাও :—

(i) বাঘমুণ্ডি, অযোধ্যা, শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, দ্বারকেশ্বর।

(ii) ব্রাহ্মণী, পলাশ, কুমারী, শিলাবতী, রূপনারায়ণ।

(iii) শিমুল, কুসুম, অজয়, বকুল, মহুয়া।

(iv) গম, কলাই, সরিষা, কেওলিন, ইক্ষু।

(v) ফায়ার ক্লে, গ্রাফাইট, ডলোমাইট, তিসি, উলফ্রাম।

(vi) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রেশম শিল্প, রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(vii) বোলপুর, ঝালদা, ঝাড়গ্রাম, ওরাওঁ, শান্তিনিকেতন।

(viii) সাঁওতাল, লোধা, বিশ্বভারতী, বীরহোড়, মুণ্ডা।

## তৃতীয় পাঠ

১। নিম্নলিখিত যে যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে তাহার পাশে √ চিহ্নটি দাও :—

(ক) ফরাক্কা বাঁধ তৈয়ারি হইয়াছে, কারণ :—

(i) গঙ্গানদীর মূল স্রোত পদ্মা নদীর দিকে সরিয়া যাইতেছে।

(ii) ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে পলি জমিয়া চর পড়িতেছে।

(iii) মৃতপ্রায় নদীগুলি জলপূর্ণ হইয়া সজীব হইবে।

(iv) কলিকাতা বন্দরের উন্নতি হইবে।

(খ) সমতলভূমির জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। কারণ :—
(i) সমতলভূমিতে গ্রীষ্ম ও শীতের তাপের পার্থক্য গড়ে ১৭° সে।
(ii) পার্বত অঞ্চলের তুলনায় বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম।
(iii) শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য বেশী নহে এবং মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
(iv) পার্বত অঞ্চল অপেক্ষা সমতলভূমিতে তাপের মাত্রা অধিক এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। কারণ :—
(i) সমতলভূমির পলিমাটি ও জলবায়ু ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।
(ii) এঁটেল মাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।
(iii) ধানের চাষ বেশী হয় বলিয়া ইহাই এই রাজ্যের প্রধান খাদ্যশস্য।
(iv) উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ধান চাষের পক্ষে উপযোগী।

(ঘ) পাটশিল্প সমভূমি অঞ্চলের প্রধান শিল্প। কারণ :—
(i) কলিকাতা এই শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।
(ii) হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটের কল আছে।
(iii) কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়ক।
(iv) পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার সুবিধা আছে।

## চতুর্থ পাঠ

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—
(i) ২৪ পরগনা জেলা — ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত।
(ii) — সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ।
(iii) নদীর নূতন গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঁককে — বলে।
(iv) রায়মঙ্গল — পড়িয়াছে।
(v) কাঁথির সমুদ্রোপকূল —।

(vi) কাঁথির সমুদ্রোপকূলে — আছে।

(vii) — নিম্নচাপের ফলে সমুদ্রোপকূলে বারিবর্ষণ হয় —।

(viii) — হইতে মোম ও মধু সংগ্রহ করা হয়।

(ix) সমুদ্রোপকূলের লোনামাটিতে নারিকেল, সুপারি, তাল প্রভৃতি — বৃক্ষ জন্মে।

(x) হলদিয়া বন্দরে একটি — স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

(xi) মেদিনীপুর জেলার দীঘা হইতে জুনপুট পর্যন্ত —।

(xii) দীঘায় — শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

(xiii) — ট্যুরিস্ট লজ আছে।

(xiv) কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রজল হইতে — উৎপাদন করা হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

### প্রথম পাঠ

১। যে কারণটি অধিক যুক্তিসঙ্গত তাহার নীচে দাগ দাও:—

(i) পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যার কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি/অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থা।

(ii) দেশ-বিভাগের কুফল উদ্বাস্তু সমস্যা/খাদ্য-সমস্যা।

(iii) প্রথম পরিকল্পনায় কুটীর শিল্পের/বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(iv) দুর্গাপুরে কোক-চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে কয়লা/তাপ-বিদ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া।

(v) ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে তৃতীয়/চতুর্থ পরিকল্পনায়।

(vi) চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ/খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রহিয়াছে।

২। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হাঁ' শব্দটি লিখ এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' শব্দটি লিখ।

(i) পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার শালবাঁধ খাল উল্লেখযোগ্য।

(ii) পশ্চিমবঙ্গের চাষ-যোগ্য জমির পরিমাণ ৫৫ লক্ষ হেক্টেয়ার।

(iii) দুর্গাপুরে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে।

(iv) কোনারে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।
(v) তিলপাড়ায় একটি সেচ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে।
(vi) মুর্শিদাবাদ জেলায় তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।
(vii) সান্তালদিতে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।
(viii) গঙ্গা বাঁধের দ্বারা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচের পক্ষে সুবিধা হইবে।

## দ্বিতীয় পাঠ

১। অশুদ্ধ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কাটিয়া দাও :—

(i) ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্কীকরণের জন্য উপকূলে টেলিফোন/রাডার যন্ত্র বসানো হইয়াছে।
(ii) দামোদর/ইছামতী নদীর বন্যা ভয়াবহ।
(iii) বাঁধে সঞ্চিত জলের দ্বারা সেচের/বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলে।
(iv) খাল কাটিয়া নদীর প্রবাহ/বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
(v) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭৪টি/৬৭টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

## তৃতীয় পাঠ

১। এক কথায় শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্যালয় —।
(ii) তৃতীয় পরিকল্পনায় — সড়কের উন্নয়ন হইয়াছে।
(iii) কলিকাতায় সি. এম. ডি. এ. — রেলপথ নির্মাণের কাজ করিতেছেন।
(iv) পশ্চিমবঙ্গে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য — কিলোমিটার।
(v) দমদম — বিমানপথের একটি প্রসিদ্ধ স্টেশন।
(vi) — উন্নয়নে পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।
(vii) কলিকাতায় একটি — কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(viii) দেশের বিখ্যাত নগরগুলির সহিত — মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়।

(ix) —বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র।

(x) শিলিগুড়িতে একটি — কেন্দ্র আছে।

## চতুর্থ পাঠ

১। বামদিকের ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীতে বসাও :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে সহায়তা করিয়াছে | (ক) তাঁত শিল্প | ( ) |
| (ii) কোক চুল্লী ও উপজাত পদার্থের কারখানা আছে | (খ) চিত্তরঞ্জনে | ( ) |
| (iii) কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প | (গ) কয়লা | ( ) |
| (iv) রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা আছে | (ঘ) দুর্গাপুরে | ( ) |
| (v) চিনির কল আছে | (ঙ) হলদিয়ায় | ( ) |
| (vi) এ্যালুমিনিয়ম তৈয়ারির কারখানা আছে | (চ) কল্যাণীতে | ( ) |
| (vii) তৈলশোধনাগার কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে | (ছ) ধনেখালিতে | ( ) |
| (viii) পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় কুটীর শিল্প | (জ) পাটশিল্প | ( ) |
| (ix) সুতার কল স্থাপিত হইয়াছে | (ঝ) জে. কে. নগরে | ( ) |
| (x) তাঁত বস্ত্র তৈয়ারি হয় | (ঞ) পলাশীতে | ( ) |
| (xi) নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা আছে | (ট) জলপাইগুড়িতে | ( ) |
| (xii) পোলট্রি ফার্ম আছে | (ঠ) উলুবেড়িয়ায় | ( ) |

## পঞ্চম পাঠ

১। এক কথায় শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) ভারত পৃথিবীর নানাদেশের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারই নাম — ।

(ii) সমগ্র পূর্বভারত কলিকাতা বন্দরের — ।

(iii) —এর চা সর্বোৎকৃষ্ট।

(iv) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি কলিকাতা বন্দরের — দ্রব্য।

(v) পশ্চিবঙ্গের — একটি নূতন বন্দর।

(vi) রাজ্যের বাণিজ্য — রপ্তানি বাণিজ্যে পরামর্শ দেন।

(vii) —শিলিগুড়ির বিমানবন্দর।

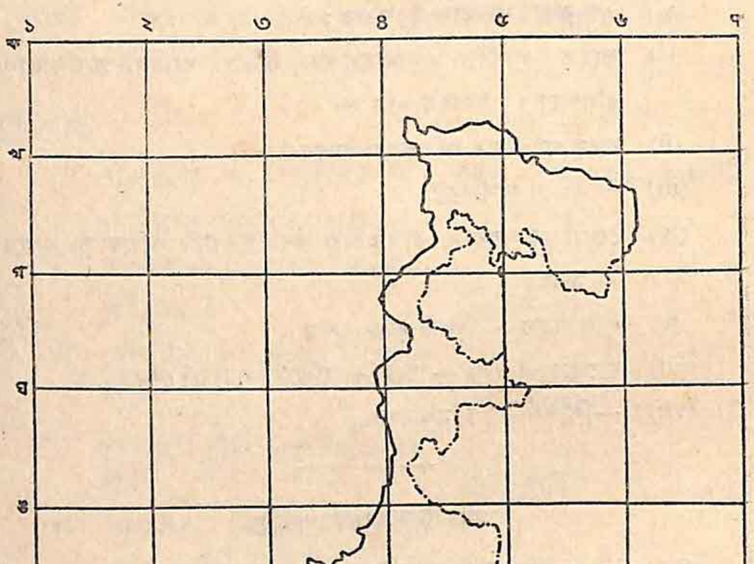
---

### মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আঁকিতে হইলে প্রথমে মানচিত্রের উপর একখানি 'ট্রেসিং পেপার' রাখিয়া উহার উপর সীমারেখা আঁকিতে হইবে। ঐ কাগজ-খানির উপর পরে আড়াআড়ি ভাবে ১—৭ ( ৭টি ) এবং লম্বায় ক—ঝ ( ৯টি ) রেখা টানিয়া চতুষ্কোণ ছক আঁকার পর দেখিতে হইবে মানচিত্রটির সীমারেখা ছকের কোন্ কোন্ স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে।

এইভাবে আর একখানি সাদা কাগজের উপর নরম লেড্ পেন্সিল দিয়া হাল্‌কা করিয়া একটি ছক আঁকিয়া লইতে হইবে। মানচিত্রের সীমারেখা ছকের যে ঘরের যে স্থান দিয়া গিয়াছে সেইভাবে আঁকিয়া চতুষ্কোণ ছকের রেখাগুলি মুছিয়া দিলে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ মানচিত্র আঁকা হইল। এইরূপে কয়েকবার আঁকা অভ্যাস করিলে ছক ছাড়াই আপন স্মৃতি হইতে যে কোন মানচিত্র আঁকা যায়।

( পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানচিত্র অঙ্কনের একটি নমুনা দেওয়া হইল )


ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

EASTERN PUBLISHERS

EP

"This book has been printed on paper allotted by Government of India at concessional rate."

মূল্য টা. ২.৪৩